KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLG	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ২১/- ২১/- ২১/- ২১/- ২১/-	Year of Publication: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ || June 1973 আষাঢ় ১৩৮০ || July 1973 ভাদ্র ১৩৮০ || Sep 1973 কার্তিক ১৩৮০ || Nov 1973 অগ্রহায়ণ ১৩৮০ || Dec 1973
	Condition: Brittle Good
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

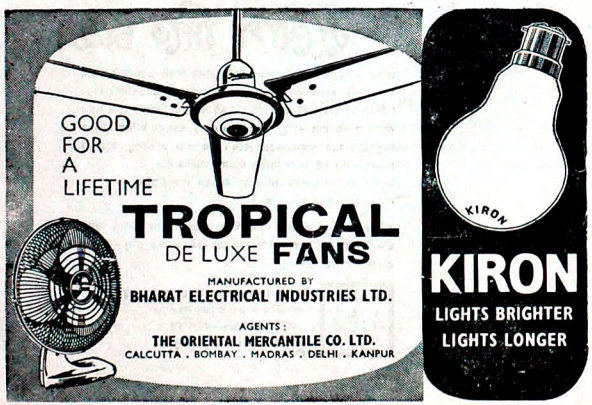

O F-I-69

একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা   আষাঢ় তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

পট ॥ বিমলেন্দু চক্রবর্তী ১০৯

প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর ॥ ত্রিপুরা বসু ১১৮

বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ॥ শৈলেনকুমার দত্ত ১২২

বাংলার লৌকিক নৃত্যধারা ॥ অজিতকুমার মিত্র ১২৭

বৈষ্ণব কবির নিসর্গ-কল্পনা ॥ দেবনাথ দাঁ ১৩২

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ১৩৬

আলোচনা ঃ রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা ॥ সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ১৪০

সমালোচনা ঃ ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট পেন্টিং ঃ
কোম্পানী ড্রয়িংস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ঃ
বীরভূমের যম পট ও পটুয়া ॥ সন্তোষকুমার বসু ১৪৫

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আঞ্চলিক ভাষায় বুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতা
এক হাজার টাকা লাভ করুন

দশম সর্ব ভারতীয় বুনিয়াদি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত যে কোনও বিষয়ের ওপর পাণ্ডুলিপি বা পুস্তকাকারে (নাটক সমেত) লেখা পাঠাবার জন্য ভারতীয় লেখক/লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিষয়

- নিবিড় পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
- পল্লীঅঞ্চলে অপুষ্টির সমস্যা।
- ব্লক ও পল্লী স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচী।
- পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ সুনিশ্চিত করার উপায়। (কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সাফল্য এবং কয়েকটি রাজ্যে তার প্রগতির অভাবের তুলনামূলক আলোচনা করুন)।
- স্থানীয় সমস্যার সমাধানে পল্লী-সমাজ কর্তৃক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের সাফল্য সংক্রান্ত কাহিনী।
- পল্লী-সমাজে নেতৃত্ব গঠন (সাফল্য-কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিন)।
- পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধান করে পল্লী জীবন সুখময় করা।
- কৃষি উৎপাদন বিভিন্ন প্রকারে ব্যবহারযোগ্য করা ও বাজারে বিক্রয়—সমবায় দৃষ্টিকোণ থেকে।
- উপজাতীয় এলাকার উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা।
- দুর্বলতর শ্রেণীগুলির সেবায় সমবায়ের ভূমিকা।
- কৃষি উৎপাদনে সহায়ক সমবায় প্রতিষ্ঠান।
- সমবায় আন্দোলনে তরুণ সমাজ।
- সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্বেত-বিপ্লব (দুগ্ধশালা-সমবায়িকা)।
- খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরকারী বিতরণ পদ্ধতিতে সমবায়ের ভূমিকা।

ভাষা

বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, গুজরাতী, হিন্দী, কান্নাড়, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু ও উর্দু।

রচনা শৈলী : এই সাহিত্য হল সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ ও সমবায় কার্যসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য। অতএব এই সাহিত্য যাতে সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী হয় তার জন্য প্রত্যেক লেখার ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হওয়া চাই।

আয়তন : পাণ্ডুলিপি/বই মোটামুটি দশ হাজারের মত শব্দ সম্বলিত এবং তা উপযুক্ত চিত্র সম্বলিত হওয়া চাই।

পুরস্কার : প্রত্যেক ভাষায়, যে রচনাটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, সেইটির জন্য এক হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে।

লেখস্বত্ব : পুরস্কৃত রচনার লেখস্বত্ব ভারত সরকারকে অর্পণ করতে হবে যার দরুন লেখককে অতিরিক্ত এক হাজার টাকা দেওয়া হবে।

লেখা পাঠাবার নিয়ম : প্রত্যেক লেখা দু'কপি করে পাঠাতে হবে এবং তার সঙ্গে পাঠাতে হবে একটি তিন টাকার ক্রসড পোস্টাল অর্ডার (পেয়েব্‌ল্ টু—'দি ডিপার্টমেণ্টস অফ কমিউনিটী অ্যাণ্ড কো-অপারেশন, নিউ দিল্লী পোস্ট অফিস)।' পোস্টাল অর্ডার সমেত এ লেখা পাঠাতে হবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড-এ, ডি, করে। এ' ঠিকানা থেকেই প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য নির্দেশ পাওয়া যাবে।

ঠিকানা হল :—
ডিরেকটার (বেসিক লিটারেচার)
মিনিষ্ট্রী অফ এগ্রিকালচার,
গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া,
(ডিপার্টমেণ্টস অফ কমিউনিটী
ডেভালাপমেণ্ট অ্যাণ্ড কো-অপারেশন)
কৃষি ভবন : নিউ দিল্লী—110001

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ 16-8-1973

davp 73/161

আষাঢ়
তেরশ' আশী

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

পট

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

পট ও পটুয়ার আবির্ভাব আজকের কথা নয়। তবে মানব সভ্যতার কোন স্তরে পটুয়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা বলা যায় না। ধর্ম প্রচার এবং লোকশিক্ষার এই বাহনটির আবির্ভাব সমাজের তাগিদেই ঘটেছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকাতেই পটুয়ার অস্তিত্ব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে পট আঁকা এবং পট দেখানোর উল্লেখ আছে। পটের বাস্তব উল্লেখ বিশাখা দত্তের মুদ্রারাক্ষসে আছে। মুদ্রারাক্ষসে পটুয়াদের 'যম পট্টিক' বলা হয়েছে। মুদ্রারাক্ষসের রচনাকাল নিয়ে মতান্তর থাকলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে 'যম পট্টিক' বলে বিশেষ এক শ্রেণীর পটুয়ারা ছিল একথা সর্বজন স্বীকৃত। বাণভট্ট তার 'হর্ষচরিতে' 'যম পট্টিক'দের পট প্রদর্শন নিয়ে একটি সুন্দর দৃশ্য চিত্রের অবতারণা করেছেন।

পটিদারদের ভিতর থেকেই কুম্ভকার জাতির উদ্ভব। বাংলা দেশে পটিদারদের যেমন কুম্ভকারের কাজ করতে দেখা যায় তেমনি কোন কোন কুম্ভকার পটিদারের কাজ করে। অবশ্য এ হ'ল এক রকম ব্যতিক্রম। পট যারা করে তারাইতো পটিদার। জাতিতত্ত্বে পটিদারদের সঙ্গে কুম্ভকার জাতি সংশ্লিষ্ট। মধ্যে সন্ধি রূপে গোপকন্যার অবস্থান। ভার্গবরাম মতে

'পট্টিকোৎ গোপকন্যায়াং কুলালো জায়তে ততঃ',
মতান্তরে—'পট্টকারচ্চ তৈলক্যাং কুম্ভকারো বভুব হ',

গুজরাট অঞ্চলে এক রকম পট আছে যাকে বলা হয় 'চিত্রকথী', এরাও বাংলার পটুয়াদের মত পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং একথা বলতেই হয় পট এবং পটুয়া বাংলা দেশে অভিনব নয়। সারা ভারতবর্ষে পটুয়াদের অস্তিত্ব ছিল। এই পটুয়ারা লোক শিক্ষার বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

দীর্ঘ দিন ধরে পালন করে এসেছে।

বাংলার সমাজে কোন সময় পটুয়ার আবির্ভাব হয়েছিল তা নির্ণয় করার মত কোন তথ্য নেই। বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে এদের আবির্ভাব এমন কল্পনা করার সুযোগ নেই। বাংলার সাঁওতালদের ভিতরেও পট আঁকা এবং প্রদর্শন রীতি আছে। বাংলার পটের সর্বপ্রধান সাহিত্যমূলক সাক্ষী 'কবি চণ্ডী'র পাতায়। 'কবি চণ্ডী'তে পটের উল্লেখ আছে।

বাংলায় প্রচলিত পটকে বলা হয় 'যমপট' বা যাদু পট। 'যমপট' নাম হবার কারণ বোধ হয় পটের শেষে যমরাজের রাজ্য দেখবার রীতি থেকে। পটের শেষে যমের রাজ্য দেখানো বোধ হয় খুব প্রাচীন রীতি। জীবনের অনিত্যতা প্রকাশ করার জন্যই পটের ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছিল। বৌদ্ধযুগেই এমন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। 'যম পট্টিক' নাম এভাবেই তারা পেয়েছিল।

বাংলায় পট আঁকিয়েদের 'পটিদার', 'পটুয়া' বলা হয়। আদিবাসী সমাজে এরা 'পাটকিরি' নামে পরিচিত। পটুয়ারা পট আঁকাকে বলে পট লেখা। 'লেখা' ভাষার ব্যবহার থেকে পটুয়াদের সঙ্গে চিত্রলেখকদের সংযোগ অনুমান করা যায়। 'চিত্রলেখা' কথা অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে আঁকা ছবি এবং ভাস্কর্য শিল্প দু'ই-ই বোঝাত। তুলি দিয়ে আঁকা ছবিকে আলাদা করার জন্য 'লেখ্য' চিত্র বলা হ'ত। ছবি আঁকাকে বলা হ'ত 'চিত্র লেখন'। বাংলার পটুয়ারা যেন তার স্মৃতি রক্ষা করতেই পট আঁকা না বলে 'পট লেখা' বলে থাকে।

বাংলার পটুয়াদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে রেখে গেছেন গুরুসদয় দত্ত। পটুয়ারা ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এক বিচিত্র সম্মিলন। নামাজ পড়ে আবার বিশ্বকর্মার সন্তান বলে বিশ্বাস করে। হিন্দু মুসলমানের অনাবিল সমীকরণ যদি হয়ে থাকে তবে সে গৌরব বাংলার পটুয়াদেরই প্রাপ্য। অবশ্য বাউলরা আর এক জাতীয় সমীকরণের অপরূপ ইতিহাস তৈরি করেছে। তা হ'ল অন্য প্রসঙ্গের কথা।

'পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণস্ক কোপতঃ'

বাংলার চিত্রকরদের এই হল নিয়তি!

বিনয় ঘোষের অনুমান বাংলার পটুয়ারা নিষাদ জাতির শাখা। অবশ্য কোন কোন লক্ষণ দেখে তিনি এদের নিষাদ জাতির শাখা বলে অনুমান করেছেন তা স্পষ্ট করেন নি। অবশ্য এ হ'ল নৃতত্ত্বের কথা।

পটুয়ারাই বাংলার একমাত্র চিত্রশিল্পী বলে সত্যি তারা এক কৌতূহলের বিষয়। সমাজের বহু নির্যাতন, অবহেলা, অর্থনৈতিক উপেক্ষার মধ্যে থেকেও এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী চিত্রনির্ভর জীবন যাত্রা নির্বাহ করে এসেছে।

পটুয়ারাই আদিমতম চিত্রকরদের বংশধর এ কথা বলা যায় কি না তা ভেবে দেখা উচিত। দেখা যায় অনেক পটুয়া ছবি আঁকার সঙ্গে পুতুল নির্মাণ করে থাকে। বিনয় ঘোষ এদের তক্ষণ শিল্পের কাজ করতে দেখেছেন। গুরুসদয় দত্ত পটীদার সূত্রধরের পট সংগ্রহ করেছেন। চিত্রকরেরা এক সময় সমাজের শ্রদ্ধার আসনে ছিল। পরবর্তীকালেও মানুষের পারলৌকিক ও দার্শনিক প্রত্যয়ের সুযোগ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সমাজের ধর্ম আন্দোলনগুলোর সুযোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ ধর্মের

অনুকূলে প্রচারের এক সরস মাধ্যম ছিল এদের হাতে। এদের হাত ধরেই বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

বাংলার ইতিহাসের অনেক গভীর গোপন খবর পটুয়াদের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। পণ্ডিতজনদের ব্যাপক প্রয়াসে তা আবিষ্কৃত হতে পারে। লোক শিল্পের শিল্পীদের প্রতি ব্রহ্মণ্য ধর্মের আচরণ কোন স্তরে ছিল তা পটুয়াদের—

ব্যতিক্রমেন চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ॥

এ' কথার ভিতর স্পষ্ট হয়ে আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ত্রয়োদশ শতকের রচনা।

অনুমান করা যায় লোক শিল্পের এই সবল নাটকীয় রূপের সামনে ব্রহ্মণ্য ধর্ম নিজেকে খুব অসহায় মনে করতো। বৌদ্ধ যুগের অবসানে চিত্রকর পটুয়া সমাজ অসহায় এবং আশ্রয়হীন হয়ে পরে। এই সুযোগ আভিজাত্যভিমানীরা পুরো ব্যবহার করেছে। এরপরে মুসলমানরা এদের ধর্মপ্রচারে ব্যবহার করে। এরা সামাজিক সংঘর্ষের পথে পা না দিয়ে আত্মরক্ষার সহজ পথ বেছে নেয়। ধর্মে মুসলমান হয়ে যেমন আত্মরক্ষা করে তেমনি জীবিকার জন্য অনুসরণ করে হিন্দু কাহিনী। এটা খুব বাস্তব কথা যে, "এই পটীদারদের পূর্ব পুরুষরা বৌদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হ'লেও ঐতিহ্যের দিক থেকে তারা হিন্দুই থেকে গেছে।' (লোক শিল্প রবীন্দ্র মজুমদার) এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় রাজশক্তি যখন মুসলমানদের করায়ত্ত ঠিক তেমন এক সময় এ রূপান্তর ঘটেছে। অন্যথায় এরা ধর্মে মুসলমান হবার কথা ভাববে কেন? অনেকে অনুমান করেন বিজয়ীদের আবির্ভাবের আগেই পর্দাপণ ঘটেছিল মুসলমান প্রচারকদের। 'মুসলমানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন এখানকার হিন্দু ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল।...নিম্ন বর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত করা হয়েছিল।..... ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ অত্যাচার প্রয়োজন হয় নি।' প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (বাঙালী) তারা সম্ভাব্য সব রকম মাধ্যমই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। অনেক পটুয়া তাদের প্রচারে বাস্তব সাহায্য দিয়েছে। 'এমন কি এই সব পটে খোদ মহম্মদের আলেখ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের কাহিনী চিত্রিত করা হ'ত।' (সুধাংশুকুমার রায়)

ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্খা এর পিছনে কাজ করতে আবার জাত ব্যবসায়ী বলে ধর্ম বিশ্বাস সব সময় বাঁচিয়ে চলা যায় না এটা বুঝতো। এরাইগাজীর পট আঁকিয়ে পটুয়া রূপে পরিচিত।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কাছে পট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পট ছিল তাদের কাছে প্রচারের প্রয়োজনের মাধ্যম। তার উপযোগিতা ক্রমশই কমতে থাকে। বাধ্য হয়ে পটুয়ারা হিন্দু দেব দেবীর কাহিনীর জগতে ফিরে আসে।

বাংলা দেশের পটুয়াদের মত ডোকরা শিল্পীদেরও দুর্ভাগ্য বহন করতে হয়েছে। তাদের প্রতি সমাজের এ অবিচার কেন তার বাস্তব কোন ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। এরাও পটুয়াদের মত লাঞ্ছিত শিল্পী।

কোথা হইতে বুড়ো এক ডোকরা বামন।
প্রণাম করিল মোকে একি অলক্ষণ ॥ ভারতচন্দ্র

পটের দৃশ্য একের পর এক একে চোখের সামনে নাটকীয় ভাবে উথাপন করা হয়। বিক্রমপুরে এর জন্যই প্রচলিত ভাষায় 'পট নাচানো' বলা হয়। পটে কতগুলি পর পর দৃশ্য গেঁথে তোলা হয়। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় না। ঘটনার বিশেষ মুহূর্ত শিল্পী তার কাহিনী অনুযায়ী বেছে সাজিয়ে নেয়। করুণ, কোমল, হাস্য, মিলনাত্মক, দাস্য প্রভৃতি রসের উপাদান এগুলোতে আছে।

পটের উপাদান ধর্মের বিভিন্ন কাহিনী। এগুলো মানুষের নীতি বোধকে জাগ্রত করে রাখে এবং ধর্ম প্রচারে বাস্তব ভূমিকা আছে। ধর্ম শিক্ষার তাগিদ থেকেই পটের প্রসার। জাতকের গল্পগুলো গভীর ভাবে দেখলে গল্পগুলো যেন পটের জন্য তৈরী বলে মনে হয়। অজন্তার ছবিগুলি দেখলে সন্দেহের অবসান ঘটতে পারে। শিল্পীরা যে জাতক কাহিনী আঁকায় দক্ষ এতো প্রমাণিত। সাঁচী ও ভারুত স্তূপে পটের মত করে দৃশ্য পট উথাপন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে 'গাজীর পটের' মিলটা খুব কাছাকাছি।

পটের কাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় হল রামায়ণ, চাঁদ সদাগর, কৃষ্ণলীলা, শ্রীচৈতন্য, বেহুলা, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি। সতীর সতীত্বকে করা হয়েছে মহিমময়। সন্তানের পিতৃভক্তি কৃতজ্ঞতায় কৃতজ্ঞতায় নম্র। রাজায় প্রজায় বাৎসল্য রসের স্রোত অবগাহন করে। 'একটা বিরাট মনুষ্য-সমাজ, যারা বাস করে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে বিশ্বাস করে অসংখ্য দেব-দেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় পৌরাণিক গল্প ও উপখ্যানের মধ্যে .... তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন সব কিছুরই নিখুঁত চিত্র।'

এ আদর্শ এ সমাজ বাঙালীর নিজস্ব। পটুয়ার ধ্যানে দেবতারা বাঙালী রূপ নিয়ে জাতির আত্মাকে গৌরবান্বিত করেছে। 'পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাঙলা দেশে, অযোধ্যা বাঙলা দেশে, শিবের কৈলাস বাঙলা দেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশী।' —গুরুসদয় দত্ত

আট থেকে দশ হাত এমন কি আঠারো উনিশ হাত লম্বা পট দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় পটে বহু চিত্রের ভিড়। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজানো। দু' পাশে দু'টি কাঠি লাগিয়ে জড়িয়ে রাখা হয় বলে একে জড়ানো পট বলা হয়। পট দেখবার সময় পটুয়া জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট বার পায়ার উপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে উপরের কাঠি ঘুরিয়ে পট খুলতে থাকে। ডান হাত দিয়ে ছবির চরিত্রগুলো দেখিয়ে সুর সহযোগে কাহিনী বর্ণনা করে। ছবি দেখাবার এই অভিনব রীতি তা স্বীকার করতেই হয়।

পটের পিছনে পুতুল নাচের সুদূর স্মৃতির যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়ে পড়লে অবাক হবার কিছু নেই। পট দেখতে দেখতে পুতুল নাচের কথাই মনে আসে। চরিত্রগুলি পুতুল নাচের পুতুলের আঙ্গিকে আঁকা। চরিত্রগুলো মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। পটের চরিত্রগুলো দেখলে মনে হয় এরা যেন পটের পটভূমিতে ঝুলে আছে। এ যেন নাচের পুতুলগুলি সুতোর টানের আশায় স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। অন্য দিকে পটের নাক চোখের ফাঁদ, মুখের সুডৌল রঙের বিন্যাস যেন

পুতুলের মত করে—একথা বলার সুযোগ আছে। 'ইলামবাজারের গালার পুতুলের চোখ, বর্ণ পটধৃত মূর্তির আত্মার আত্মীয়।' (লোকশিল্পের নানা প্রসঙ্গ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়) পটচিত্র আর পটুয়া সঙ্গীত পরস্পরের পরিপূরক। গানগুলোতে যথাযথ ভাবে পটের বর্ণনা থাকে না। পটে যা আঁকা নেই তাই গান গেয়ে অদেখা দৃশ্যের ব্যঞ্জনা আরোপ করা হয়। তাই পট চিত্রের পট সঙ্গীতের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার গণ সাহিত্যে পটুয়া সঙ্গীতে স্থান কম গৌরবের নয়। বস্তুত পক্ষে পটুয়াদের সাহিত্যে বা পটুয়া সঙ্গীতে বাঙালীর আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ আছে। এর একটা আলাদা মূর্তি আছে। কিন্তু পটুয়ার কাছে উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা। দর্শকের কল্পনা উদ্দীপ্ত করে তোলার এক সুচতুর কৌশল। তাই পটুয়ার শুধু পট লিখেই দায় মেটে না। তাকে সহজ কবির ভূমিকাও পালন করতে হয়। পটুয়া সঙ্গীত বাদ দিলে পটের সরসতা কমে একথা মানতেই হয়। সঙ্গীতহীন পট অনড় আচল, পট অলঙ্কার হীন গৃহবধূর রূপ নেয়।

লক্ষ্য করার মত পটুয়া সঙ্গীতের ভাষায় মধ্য যুগীয় প্রভাব আছে। এতে এটা বোঝা যায় পটে উল্লেখ করার মত কোন পালা বদলের অধ্যায় আসে নি। বংশানুক্রমে লোক শিল্পের চরিত্র অনুযায়ী পট ও পটুয়ার সঙ্গীত এক রকমেই থেকে গেছে। কাহিনী, দৃশ্য, ভাব, অঙ্কন কৌশল এক থাকাতে নতুন নতুন সঙ্গীত তৈরী করার তেমন কোন উৎসাহ সঞ্চার হয় নি। তাই তারা আজো পট মেলে গান ধরে—

মনসা জগৎগৌরী জয় বিষহরি।
অষ্টম নাগের মাথায় পরমা সুন্দরী ॥
নাগের হোলো ঘাটপাট নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলে বেড়ায় পৃথে দেবীর আসন ॥

পট আঁকায় জমি, তুলি রং এসব পটুয়ার নিজের হাতে তৈরী। লোক শিল্পে ব্যবহার করা উপাদান লোক শিল্পীদের সংগ্রহ করাই রীতি। দেশজ নীল, মেটে সিঁদুর এলামাটি। গেরিমাটি, খড়িমাটি হরিতাল প্রভৃতি ধাতব এবং উদ্ভিদ রংয়ের সাহায্যে পটুয়ারা পটের অপরূপ জগৎ গড়ে তোলে। প্রদীপের কালি থেকে আসে কালো রং। তেতুল বীচি বেলের আঠা আর এক উপাদান। নারিকেলের মালা হল রং গোলার পাত্র। ছাগলের ঘাড়ের এবং তল পেটের লোম হ'ল তুলি তৈরীর উপাদান।

কাপড় পরবর্তী সময়ে কাগজের উপর পটচিত্র আঁকা হত। কাগজের উপর কাগজ আটকে কাগজখানাকে মজবুত করে নিত। আঁকার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে জমি তৈরী করে নিয়ে লাল রেখার বহিঃ রেখা এঁকে নিত। তারপর শুরু হত অন্য রংয়ের কাজ। একের পর এক রং লাগিয়ে জায়গাগুলোকে ভড়াট করে জমজমাট করে তোলা হ'ত। রংয়ে আঠা ব্যবহার করা হয় বলে একে টেম্পরা রীতির ছবিও বলা যায়।

অতি সাধারণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এরা যুগের পর যুগ সমাজের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে। কি করে জনগণকে খুশী করা যায় শিল্পীর সামনে খুব বড় একটা সমস্যা। অথচ এই পটুয়ারা সহজেই এ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। এত সহজ উপাদানের মাধ্যমে কি করে অসাধারণ দায়িত্ব

অনায়াসলব্ধভাবে চালিয়ে এসেছে ; কেন না পট মাত্রেই উচ্চাঙ্গ শিল্প নয়। অনেক কাঁচা হাতের রেখা, ত্রুটিপূর্ণ বর্ণ বিন্যাস, রচনার পর ভাব ভাঙীতে বাস্তববোধের অভাব আছে। অথচ পুরো পটখানি যখন চোখের উপর সচল গতিতে যাত্রা করে তখন রসভঙ্গের কারণ ঘটে না। সুতরাং বলতেই হয় গভীর ভাব ও সরল রচনাভঙ্গী পটের প্রাণ। বর্ণবিন্যাসের সরলতা এর ঐশ্বর্য। সহজ অনাবিলতার এক অপরূপ রস আছে। সেই রস পটের অবয়বে বিধৃত। দর্শকের দলও যে সহজে খুশী হ'তে পারে একথা মানতে হয়। শিশুর অনাবিল রসে বাংলার পট চিত্র আগাগোড়া মোড়া আছে।

দর্শক মাত্রেই পটে আঁকা বিষয়বস্তু সত্য বলে বিশ্বাস করে। একটা দেশের বিরাট মানব সমাজের বিশ্বাস পটে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়—পটের জনপ্রিয়তার এটাও একটা কারণ হতে পারে। সরল মানুষগুলির কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—একথা বলতেই হয়।

পটের সহজ সারল্য এবং বিশ্বাসই এর প্রাণধর্ম। তাই পটকে বলা যায় সরলগণ মানসের সহজ সুন্দরী। গৃহবধূ যেমন সংসারে সহজরূপে অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় অপরূপের ইশারা দেয় পটও তেমনি। তাই পট চিরন্তনের সম্পদ। দর্শকের কাছে পট নিত্য-নবীন, চির সত্যের প্রতিভাস মাত্র।

পট আঁকার রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার জোরালো রেখা। অজন্তায় এবং কালীঘাটের পটে আমরা যে রেখা দেখি, রেখার যে স্বভাব, জড়ানো পটের রেখায় তা নেই। অজন্তা বা কালীঘাটের রেখা দেহের ভৌল এবং ওজনের স্পষ্ট ধারণা দেয়। দেহের উঁচু নীচু বোধ দর্শকের মনে সৃষ্টি করতে পারে। পটের রেখায় এ গুণ একেবারেই অনুপস্থিত। জড়ান পটের রেখা ঘুরে ঘুরে কখনো তরঙ্গায়িত হয়ে ছবির অবয়বে আশ্চর্য ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

সম-চরিত্রের রেখা পুঁথির পাতায় দেখার কোন দৃষ্টান্ত নেই। পুঁথির পাতায় আমরা যে রেখা দেখি তার স্বভাব তীক্ষ্ণ এবং কোনালো হয়ে ওঠা। গুজরাট থেকে উড়িষ্যা হয়ে এরকম রেখা ব্রহ্মের প্রাচীর চিত্রে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তালপাতাই কোনালো তীক্ষ্ণ রেখা সৃষ্টির কারণ। নয়তো রেখার এমন ধাতব প্রলেবতা আবিষ্কারের অন্য কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না।

পটের রেখা স্বতন্ত্র। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জোরালো টানে রেখাগুলো টানা। রেখা অবলীলায় গড়িয়ে যায়।

"এই সব জড়ানো পটের সঙ্গে মুঘল রীতির বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। মিল ছিল দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার প্রাচীন রীতির। সে ছিল মূলত চিত্র রীতির, অর্থাৎ সমান ফ্লাট জমিতে দুই মাত্রিক অলঙ্কারময় চিত্রণের, যাতে ভল্যুম, ম্যাস, পারস্পেক্‌টিভ্ থাকতো না। (অশোক মিত্র। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস)

একথা স্বীকার করতেই হয় পটের রেখার সহোদর রেখার ব্যবহার ভারতবর্ষের অন্যত্র আছে। কিন্তু সে সব রেখার সঙ্গে পটুয়াদের পটের রেখার সমধর্মীতা নেই। এ রেখার উৎস অজ্ঞাত তেমনি এরেখা যে অপরের ধার করা অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি তা বলার সুযোগ নেই। এ রেখা বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ।

ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে পটুয়ারা পট অবিকৃত কেমন করে রাখলো। বাংলাদেশের শিল্পে স্থাপত্যে ইসলামী প্রভাব আছে দেখতে পাওয়া যায়। "মুসলমানেরাই পোড়ামাটির অলঙ্করণের রীতি এবং নকশা সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।" (ম্যাক্‌কাচন) অথচ লোকশিল্পের মাধ্যমগুলি দীর্ঘদিন মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের আওতায় থেকেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছে। পটুয়ারাতো মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেছে। তাদের জীবনযাত্রায় মুসলমানী প্রভাব স্পষ্ট। অথচ তার বিন্দুমাত্র ছাপ তাদের পটে পড়েনি। আশ্চর্য এক মমতায় মাতার মত মুসলমানী শিল্পের ছোঁয়াচ থেকে পটকে নির্ভেজাল অবস্থায় রক্ষা করেছে।

পটের রেখা এবং ফ্লাট দেহাবয়বের মধ্যে আমরা শিল্পের এমন এক পরিণতি দেখি যা ব্যাপক আলোচনার বিষয়। একথা বলতে হয় পটে চোখে দেখার অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। জোর দেওয়া হয়েছে 'ভাবের দেখা' রূপের লীলায়। ব্যাঞ্জনাই প্রধান, কল্পনাই মূল ধর্ম, অপার্থিব রহস্য-এর কেন্দ্র-বিন্দুতে রসমূর্তিতে তরঙ্গিত।

রঙ ব্যবহারের অভিনবতা আর এক কথা। রঙ আসে আলোর হাত ধরে। পটের আলো পটের পশ্চাতে। তাই পটুয়ার আলোর কোন সমস্যা নেই। পটের রঙ চরিত্র বর্ণনা করে না শুধু রঙের মায়া অঞ্জন চোখে লাগিয়ে দেয়। রঙ কখনো উজ্জ্বল কখনো সন্ধ্য পরিণীতার মত নম্র।

সীমা থেকে অসীমের রহস্যময়তার পথে যাত্রাই হচ্ছে পটচিত্র। তার অনেক অনেক বিপরীত জিনিষ এবং অসংলগ্নতা আছে। সেটাই বড় কথা নয়। পটই একমাত্র চিত্র যা বাঙলার চিত্রকলার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

পটুয়ার পটচিত্রের দোসর খুঁজতে হলে খুঁজতে হবে বাঙলার মাটীতে। বাস্তবিক পটের দোসর বাংলাদেশে আছে। পটের সাদৃশ্য লভ্য একমাত্র বাংলার মৃৎফলকগুলিতে। পাহাড়পুরের এবং ময়নামতীতে যে পোড়ামাটির টালিগুলি দেখি তার সঙ্গে পটের সম্পর্ক বড় নিকটের। "বহিঃসীমা নির্দেশ করার জন্য রেখার সাহায্যে মূর্তির নকশা তৈরী পুরাকালে একটি বিশিষ্ট শিল্প বলে গণ্য হত। ...পটচিত্রকে ভিন্ন উপাদানে মৃৎশিল্পের ধারাবাহী বলে বর্ণনা করা যায়, কারণ প্রান্তরেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ হচ্ছে পটশিল্পের বিশেষত্ব, আর বাংলার মৃৎশিল্পেও বহিরঙ্গ রেখাঙ্কণ শিল্পীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করত। এইরূপে বাংলার পটশিল্প পোড়ামাটির টালির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, এমন কি প্রান্ত রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি মৃৎশিল্প থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।" (অজিত ঘোষ)

পটচিত্রে আঞ্চলিকতা আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস অর্থনৈতিক পট আগে না পোড়ামাটির মৃৎফলকগুলো আগে তা নির্ণয় করার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পটকে যদি মৃৎফলকগুলি অনুসরণ করতে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আবার উল্টোটাও যে ঘটতে পারে না এমন নয়। সুতরাং কে কাকে অনুসরণ করেছে তা নির্ণয় না করা গেলেও এটা খুব বাস্তব সত্য—"পটের ছবির ছাঁদ গঠন ভৌল প্রভৃতির সঙ্গে মন্দিরের পোড়ামাটির ইটের অলঙ্করণ তার রূপ, আকৃতি টান, রেখা ভঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর বাহ্য মিল যতটা না তারো বেশী অন্তরের মিল।" (লোকশিল্পের নানা প্রসঙ্গ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পট আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। আঞ্চলিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রকৃতি পরিবেশের প্রভাব এ বৈচিত্র্যের উৎসভূমি। পার্থক্য যা তা একটি বৃক্ষের বহুবর্ণের পল্লবের মত। এগুলোকে আঞ্চলিক রীতিও বলা যেতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব জনিত ব্যতিক্রম। তার ফলে কোন কোন অঞ্চলে রং ও কাহিনীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। 'প্রতিভাবান শিল্পী বা পরিবারের চেষ্টায় হয়তো কোন এক গ্রামে একটি ঘরানা বা সকুল গড়ে উঠেছিল দেখতে পাই পাশাপাশি অন্যান্য অনেক গ্রামের পটুয়ারা তারই নকল করে চলছেন। (সুধাংশুকুমার রায়)

আশুতোষ মিউজিয়ম ও গুরুসদয় মিউজিয়মে কয়েকটি পট আছে যা ইণ্ডিয়ান রেডের জমির উপর নীল সবুজের ব্যবহারে সজীব হয়ে উঠেছে। রংয়ের উজ্জ্বলতাই এর প্রাণ। মাঝে মাঝে সাদা রংয়ের ব্যবহার চরিত্র গুলিকে যেন নাড়াচাড়া দিয়ে সজীব করে তোলে। বাহুল্য বর্জিত রংয়ে রেখায় গভীর ব্যঞ্জনা এনে দেয়। ক্রপদী রসে পটগুলির সারা অবয়ব মণ্ডিত হয়ে আছে। এ পট আহমদপুর আয়সে এর পটুয়াদের আঁকা।

মেদিনীপুরের পটুয়ারা লোকমুখী। প্রচলিত কাহিনী এঁকে তোলার দিকেই তাদের ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। পটের গল্পগুলি একটু অদ্ভুত জাতের একথা বলতেই হয়। গল্পের পত্র পল্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে অতীত বাংলার হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি আভাস। একদা স্মরেরীয় মিশরীয় জন পদের সঙ্গে বাঙলার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষীও আজ আর অলভ্য নয়। মেদিনীপুরের পটে আছে তার ছায়া। মেদিনীপুরের পটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার দীর্ঘায়ত অবয়ব এবং একাধিক চরিত্রের সমাবেশে। একই পটভূমিতে একাধিক চরিত্র সমাবেশ আনে পটুয়ারা অকৃপণ হাতে। প্রশস্ত ললাট আর আয়ত চক্ষু আর এক বৈশিষ্ট্য।

পটের রং উজ্জ্বল নীল। নীলের পটে দরাজ হাতে সাদা বুটির অলঙ্করণ। লাল ব্যবহার করা হয় ঘন করে।

ঠেকুয়া চকের পট ব্যতিক্রমের লক্ষণে উজ্জ্বল। বাংলার ঠেকুয়া চকের শিল্পীরা জাপানী শিল্পীর যেন দোসর। জাপানী শিল্পীর মত হাল্কা হাতের তুলির ছোঁয়া কেমন করে এল বাংলায়! পটের জমির রং হাল্কা। তার উপর হাল্কা হাতে তুলির টানে পটের চরিত্র। ফিকে নীল রং। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার দিকে ঝোঁক। সকালে শিউলি ঝরার আমেজে যেন পটে আগা গোড়া মোড়া। অনেকের মতে এ চিত্র রীতি নবীন। এবং পটের এ রীতিই সর্বাধুনিক শুধু নয় শেষ রীতিও বোধহয়।

ইওরোপে কিউবিজিমের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে। তার পূর্বসূরী পাওয়া যাবে বাংলাদেশের পটে। বাস্তবিক বংলার পটে কিউবিজিমের বাস্তব উপস্থিতি আছে। জন্ম নিয়েছে সূত্রধর পটুয়ার হাতে। মেরতলা গ্রাম থেকে এ রকম পটের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন গুরুসদয় দত্ত। এগুলো উনবিংশ শতাব্দীর ফসল। 'আমরা এ রকম পট দেখেছি যার সঙ্গে কিউবিজমের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে অনেকে হয়ত এ ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই বিংশ পটটি কিউবিক শিল্পের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের বহু পূর্বের আঁকা হয়।'
(অজিত ঘোষ)

উনবিংশ শতাব্দিতে কাঠের পালঙ্কে গ্রীক ভাস্কর্যের নকল এক জনপ্রিয় রীতি। গ্রীক ভাস্কর্যের

ড্রেপারীর কাজ লীলায়িত ভঙ্গীময় নয়। এই বিলেতী পুতুল দিয়ে কাঠের পালঙ্ক তৈরী করার অভিজ্ঞতাই বাংলার কিউবিজিমের জন্মের ভিত্তিভূমি। ড্রেপারির ভাঁজ থেকেই বের হয়েছে কিউবিজিয়মের রেখা। রেখার কি পটের আঙ্গিকে বিদেশী প্রভাব না থাকলেও এগুলোর নেপথ্যে নায়ক যে বিদেশীয় মূর্তি একথা মানতেই হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ হল এক ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত। কারণ এ রীতির অন্য কোন পটের নিদর্শন আর পাওয়া যায় নি। তাই এর আকস্মিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে কোন পটুয়া এ রীতি ব্যবহার করে নি। নব্য কিউবিজিমের রীতি তাদের অনুপ্রাণিত করে নি বলেই বুঝতে হবে।

বিষ্ণুপুরের পটের মর্মটুকু আলাদা ধাঁচের। তারা যেন অতীত বাংলার চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যের এক বাস্তব ইশারা তুলে ধরে। একদা বাঙালী শিল্পীরা বৃহৎ ফ্রেস্কোচিত্র আঁকায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিষ্ণুপুরের পট যেন তার স্মৃতি পরম মমতায় লালন করে চলছে। এ মমতা স্পষ্ট নয় বরং গোপনচারী। বিষ্ণুপুরের পটে চরিত্র রূপায়নের ভঙ্গীতে ফ্রেস্কো আঁকার স্মৃতি ধরা আছে।

পটুয়াদের ছবি নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরাই একমাত্র শিল্পী যারা বাংলার চিত্রশিল্পীর জীবিকা বহন করে এসেছে। তাই এদের প্রসঙ্গে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দুর্ভাগ্য পটের আলোচনায় আজ পর্যন্ত যথার্থ গবেষকের আবির্ভাব ঘটেনি। তার ফলে পটের রহস্য আজো আমাদের কাছে ছায়াময় জগতের সামগ্রী হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর থেকে পুরানো কোন পটের সংগ্রহ নেই।

প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর

ত্রিপুরা বসু

বর্ধমান হাওড়া সেকসানের ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন থেকে মাত্র মাইল তিনেক দূরে মৃতপ্রায় নদী সরস্বতীর তীরে ছোটগ্রাম সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। নিকটস্থ রেল ষ্টেশনটির নাম আদি সপ্তগ্রাম। গ্রামের বুক চিরে বেরিয়ে গেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। দূরে কাছে কয়েকটা ছোট বড় কলকারখানা। কিন্তু নগরজীবনের উন্মত্ত কোলাহল এই চিরনিদ্রিত প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের নিস্তব্ধ জীবনের ধারে কাছেও আসতে পারে নি। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর সপ্তগ্রাম। আর সবকিছুর ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে একাকী, একপ্রকার পরিত্যক্ত। ইতিহাসের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা সপ্তগ্রামের বিবর্ণ অধ্যায়ে এসে ভিন্ন পথ ধরেছে।

একটু পুরোনো দিনের কথায় যাওয়া যাক। মহাভারতে সুহ্মদেশের বর্ণনা বা অবস্থিতি পরবর্তীকালে স্পষ্ট ইতিহাস সাদরে গ্রহণ করেছে। গ্রীক পণ্ডিত টলেমী তাকেই বলেছেন 'গঙ্গারিডি'। এর রাজধানী ছিল 'গঙ্গেশ রিজিয়া' যার পরবর্তী নাম 'সপ্তগ্রাম' বা সাতগাঁ। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসে বিপাশা নদীতীরে অবস্থানকালে (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ) আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দুটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্ব জানতে পারেন। তন্মধ্যে একটি হোল 'গঙ্গারিডি' বা রাঢ়দেশ। এর রাজধানী ছিল গঙ্গাবন্দর। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক ও প্লিনির তথ্য অনুসারে জানা যায় 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের অধিপতির ছিল ষাট হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। Diodorus Siculus এর মতে ঐ সময় ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে গঙ্গারিডিই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

হিউয়েন সাঙ্, ইৎসিং, মেগাস্থিনিস প্রমুখ বৈদেশিক পর্যটকগণ বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলির সম্পর্কে সম্যক বর্ণনা দিয়েছেন। হিউয়েন সাঙ্ তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের (শশাঙ্কের রাজধানী রাঙ্গামাটি) প্রশংসা করলেও গঙ্গারিডির রাজধানী 'সপ্তগ্রাম' বা সাতগাঁ বন্দরটির নামমাত্র উল্লেখ কেন করলেন না কে জানে! তবে কি তিনি সপ্তগ্রামকেই তাম্রলিপ্তি বলে চালিয়ে দিয়েছেন? তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ন সম্পর্কে অনেক কিছুই বললেন অথচ 'গঙ্গেশ রিজিয়া' বা সপ্তগ্রাম সম্পর্কে নীরব থাকলেন কেন? এ প্রশ্ন আজ বহুপ্রশ্নজড়িত।

সপ্তগ্রাম ঠিক কতদিন আগে সস্থানে অবস্থিত ছিল তা বলা নিতান্ত শক্ত ব্যাপার। তবে তার অবস্থান ছিলো বঙ্গোপসাগরের তীরে। দুহাজার বছরে সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে। সে হিসাবে সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির চেয়েও প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এই পরাক্রান্ত বন্দর বা রাজধানীটির খবর পেয়েছিলেন (Mccrindle's Ancient India, its invasion by Alexander the Great)।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতির সঙ্গে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক

সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। তবে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণদানে কালের সাক্ষী ইতিহাস নিতান্ত নীরব। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার ওরগাঁদা, সিলদা, অটজুড়ি, সাহারি, ভাভাবাঁধ, পান্না, কুকড়াঘুপী, গিদনি, চিলকিগড়, বাঁকুড়া জেলার কালা লালবাজার, মনোহর, বন আসুরিয়া, শহরজোড়া, কাঁকড়াদ্বার, বাউরিডাঙ্গা, কাসিন্দা এবং বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতঘেনী, সাগরভাঙ্গা, আড়া প্রভৃতি প্রায় বাইশটি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গ প্রায় নীরব।

পরবর্তীকালে মাধবাচার্যের চণ্ডী (১৫৭৯), দ্বাদশ শতকের শেষভাগে রচিত লক্ষ্মণসেনের সভাকবির কাব্য, মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ও সর্বোপরি কবি কৃষ্ণরামদাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীনবন্দরটির অবলুপ্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া গেলেও এর অধিক পূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। অর্থাৎ এক হিসেবে ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের সপ্তগ্রামের ঐতিহ্য আমাদের অনুমান করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের আমলে পাঠান সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দীন-বক্তিয়ারখলজী বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম মুসলমান দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এই সপ্তগ্রামে। এত জায়গা থাকতে সপ্তগ্রাম বন্দরটাই খলজী সাহেবের কেন পছন্দ হোল তার নানাপ্রকার কারণ আছে। তখন অবশ্য বঙ্গোপসাগর অনেক দূরে সরে গেছে। সপ্তগ্রাম তখন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দর, সমুদ্রবন্দর নয়। এটি একহিসেবে ভূখণ্ডের মধ্যভাগে। যাতায়াতে সুবিধা, সবচেয়ে বড় কথা স্বীয় শত্রু লক্ষ্মণসেনকে লক্ষ্য রেখে গোপনে তার সর্বনাশের জাল বিস্তারের জন্য এখানটি উপযুক্ত বলে খাঁ সাহেব অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন।

এরপর ইতিহাস বলে, বাদশাহ মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গদেশের একাংশের রাজধানী হোল সপ্তগ্রাম। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের মধ্যমপুত্র রুকুদ্দিন শাহের রাজ্যের শেষের দিকে সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্তৃক পুরোপুরিভাবে বিজিত হয়। কিন্তু তা কবে? গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে একটি পাথরের দেবমন্দির ছিল—এটি ঠিক মন্দির নয়। জাফর খাঁর সমাধি। এখানে পূর্বে অনেক হিন্দু বৌদ্ধ মন্দিরও ছিল। সে সমস্ত পাথর ও ইট নিয়ে পরবর্তীকালে আদি সপ্তগ্রামে জি, টি, রোডের ধারে একটি বড় মসজিদ তৈরী হয়। এতে একটি প্রাচীন আরবী শিলালিপি বসানো হয়। তার পাঠোদ্ধার করে স্বর্গত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেন, '৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খ্রীঃ) একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল এবং নির্মাতা বাকর খাঁ হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানদিগকে ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন Journal of the Asiatic Society—1870) কিন্তু এই শিলালিপি এখন অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাজার নাম ছিল কিন্তু সেই স্থান ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং সপ্তগ্রাম রুকনুদ্দিন শাহের রাজ্যকালে বিজিত হইয়াছিল কি ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে—তা বলা শক্ত।' সুতরাং সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণবঙ্গের এই এলাকার প্রথম শাসনকর্তার নাম আজও অজ্ঞাত। এরপর ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন ও ইজুদ্দিন কর্তৃক পরাজিত হন।

এর পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক টাঁকশাল নির্মিত হয় ও বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন অধিকর্তা স্ব স্ব নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। বর্তমানকালে বিশেষ ঘটনা বা পর্বোপলক্ষে সরকার প্রচলিত ডাকটিকিট ব্যবস্থার ন্যায় মুদ্রাঙ্কন একটি প্রাচীন পদ্ধতি।

সম্রাট প্রথম মুহাম্মদশাহের আমলে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে জানা যায়, ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দিন বরবকশাহ সপ্তগ্রামের শাসক ছিলেন। বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন্ বতুতা বঙ্গদেশের এই প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সপ্তগ্রামের চতুষ্পার্শে মুসলমান আমলে অনেক সৌধ নির্মিত হয়। যেমন শেখ জামালউদ্দিন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর দুবছর পরে জামালউদ্দিনের সমাধি নির্মিত হয়। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় 'কদম রসুল'। বর্তমানে এসব পুরাবস্তু প্রায় অবলুপ্ত। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচেই বোধ হয় এই সৌধগুলি অস্তিমনিদ্রায় শায়িত। যে কয়েকটি অবস্থিত আছে তন্মধ্যে পথিপার্শে ছাদহীন একটি ভগ্ন মসজিদ, সৈয়দ ফকরুদ্দিনের সমাধি ও পীরের দরগা—এগুলি সপ্তগ্রামের মুসলমান আধিপত্যের খণ্ডক্ষুদ্র প্রমাণ।

হুসেন শাহের বাংশধর মুহম্মদ শাহকে পরাজিত করে শেরশাহ ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার করে সারা দেশকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেন ও প্রতি সরকারে একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত হয়। এমন একটি মুল ফৌজদারী কেন্দ্র হোলো সপ্তগ্রাম। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম টাকশাল থেকে সপ্তগ্রামের পরবর্তী শাসক সামসুদ্দিন মহম্মদ শাহ্ গাজীর নামে মুদ্রা তৈরী হয়। কিছুদিন পর বিহারের শাসনকর্তা সোলেমান করররাণী বঙ্গদেশ জয় করলে সামসুদ্দিনের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হয়।

আকবরের শাসনকালে বাদশাহী সড়ক সপ্তগ্রাম থেকে জাহানাবাদের মান্দারণ পর্যন্ত টেনে আনা হয়। এ সময় আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় যে তখন দক্ষিণবঙ্গে সরকার সুলেমানাবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার সাঁতগাঁও নামে তিনটি জেলার অস্তিত্ব ছিল। সরকার সাতগাঁও এর পঞ্চাশটি মহালের উপসত্ব ছিল চার লক্ষাধিক টাকা। পরে সাতগাঁও-এর উপকণ্ঠে 'হাভেলী' মহল গঠিত হয়। এটিই বোধ হয় বর্তমানের হালিশহর।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে যখন পর্তুগীজদের আবির্ভাব ঘটেছে তখন চট্টগ্রাম সুবর্ণগ্রামের চেয়ে সপ্তগ্রাম বন্দরের খ্যাতি কোন অংশে কম নয়। তবে এটি তখন 'A fair citie for a citie of Mores (Musalmans) and very plentiful and Sometimes Subject to patnas' অর্থাৎ কখনও কখনও বিহারের অধীন।

বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভের আশায় পর্তুগীজ জল দস্যুরা সপ্তগ্রামের সুলতান ৩য় মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করতে এল অজস্র উপহার নিয়ে। কিন্তু সুলতান উল্টে রেগে গেলেন? তাদের দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচারের সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। তাই এবার তাদের সমস্ত জাহাজ ও মাল বাজেয়াপ্ত করলেন। তখন সরস্বতী নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলতো। বড় বড় জাহাজ হুগলী দিয়ে এখানে আসতো। ইতিমধ্যে শেরশাহের বঙ্গদেশ আক্রমণকালে অবশ্য পর্তুগীজদের কাছ থেকে সুলতান যথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কথা। এ সময় থেকে আর বড় বড় জাহাজ সরস্বতী নদী দিয়ে আসতে পারলো না। সুলতানও দেহরক্ষা করেছেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে গোলও মিটে গেছে। কিন্তু

ব্যবসাবাণিজ্যের ধারা সপ্তগ্রামে তখনও জোর কদমেই চলেছে, যদিও পলিগ্রস্ত বন্দরে জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধার কথা জানা যায় 'দ্য এশিয়া' থেকে, 'Satgaw is a great and noble citie though less frequented than Chittagong on account of the post being not so Convinient for the entrance and departure of ships'

এরপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারের ফলে যখন নদী বা সমুদ্রপথ বড় বিপজ্জনক হয়ে উঠলো, ছোট ছোট জাহাজ আর তখন সপ্তগ্রামে আসতে পারলো না। বড় জাহাজ তো আর এলোই না। সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের আক্রমণ ও অত্যাচার থেকে সদর দপ্তর সুরক্ষার জন্য সপ্তগ্রাম থেকে সরকারী দপ্তর হুগলীতে সরানোর নির্দেশ দিলেন ও বাংলার তৎকালিক নবাব নাসিম খাঁকে পর্তুগীজ দমনের আদেশ দিলেন। হুগলী থেকে পর্তুগীজরা অনতি বিলম্বেই বিতাড়িত হয়। এরপর থেকেই সপ্তগ্রামের জৌলুষ কমতির দিকে। ধনাঢ্য বণিকেরা উঠে এলেন নতুন বন্দর হুগলীতে। অবশ্য এরপর ক্ষীণভাবে স্থলপথের সঙ্গে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য চলেছিলো। কিন্তু মুর্শীদকুলীখাঁর সময়ে সপ্তগ্রাম বা সাঁতগা নামটাই বদলে গেল। আজ কোথায় সেই কোলাহল মুখর অবলুপ্ত বন্দর সপ্তগ্রাম। এখানেই একদিন বিদেশী স্বদেশী ধনাঢ্য বণিকদের আনাগোনা ছিল। ঘাটে বাঁধা থাকতে ছোট বড় অজস্র বাণিজ্যপোত। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাক্ষী সেই সপ্তগ্রাম কবে কিভাবে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে, কেউ তার হিসেব রাখে না। আজকের সপ্তগ্রামের ঝোপঝাড়, খালবিল, বন-বাদাড়, পরিত্যক্ত ঢিপিগুলোর মধ্যে ও মৃতপ্রায় নদী সরস্বতীর বালিয়াড়ির গহ্বরে সপ্তগ্রামের ঐতিহ্যের জীর্ণতম অংশকেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলাদেশে বহু বিবাহ এবং গৌরীদান প্রথার অনিবার্য ফল হিসেবে বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তরুণী ভার্যার দুর্গতি বেড়েছিল চরম। তারই একটা বীভৎস সমাধান হিসেবে শেষপর্যন্ত শুরু হয়েছিল সতীদাহ প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালিকা পত্নীদের সহমরণে চাপিয়ে তাদের জীবনের ছেদ এনে সে-যুগের একটি কুসংস্কার রাজত্ব করে এসেছে বহু বছর ধরে। সে-যুগের মানুষের এই সংস্কার এমনই বিকৃত ছিল যে, তারা কখনও এইসব অবলাদের কথা একবারও চিন্তা করেনি। সে যুগের মানুষের মনোভাবটি আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে—'পুরুষ ষাট বৎসরের বুড়ো হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু শব্দটিও করে না। কিন্তু নারী ১২।১৩ বৎসরে বিধবা হইলেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক সন্ধ্যা আহার করুন, সর্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করুন, ভ্রাতার সংসারে আধাদাসী হইয়া কাল যাপন করুন……।'

কিন্তু অত্যাচার অনাচার যখন দানা বেঁধে স্ফটিকে পরিণত হয়, তখনই সাধারণত তার শেষপর্ব ঘনিয়ে আসে। যুগগুরু রামমোহনের হাতে তাই তার সমাপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ দিনের শিকড় বসা এই প্রথা বিলুপ্ত করতে রামমোহন রায়কে যতই বেগ পেতে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সাহচর্যে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব হয়। সেই ঐতিহাসিক দিনটি হল ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর।

সতীদাহ বন্ধ হতে সমাজে নাবালিকা কিশোরী বিধবাদের অত্যাচার বন্ধ হয় ঠিকই এবং বাংলাদেশে একটি বীভৎস অমানুষিক সামাজিক বিধির ছেদ পড়ে, একথাও সত্য; কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। দারিদ্র্য বা কুলরক্ষার অজুহাতে যেসব কিশোরীদের যৌবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল বৃদ্ধ স্বামীর কাছে—তাদের জীবন রক্ষা পেলেও, জীবন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। তাই কার্যকারণ সম্বন্ধেই তাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পুনর্বার বিবাহ প্রদানের প্রশ্নটি প্রগতিশীল সমাজে প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে।

অবশ্য বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন একটি কুপ্রথা বিলুপ্তির অনিবার্য ফল হিসেবে প্রকটিত হলেও, আন্দোলনটি কিন্তু অতি প্রাচীন। বিদ্যাসাগরের সক্ষম প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে এটি ফলপ্রসূ হলেও এ আন্দোলন শুরু হয় তাঁর বহু আগে। বিদ্যাসাগরের দেড়শত বৎসর আগে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহ চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য তিনি সফল হতে পারেন নি। দেওয়ান কার্তিক, চন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে' জানা যায় যে, বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতার যে বচন নির্ভর করে এই আন্দোলন শুরু করেন, নবদ্বীপের রাজা শ্রীশচীন্দ্র বহু পূর্বেই সেই বচন নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সে পর্ব ছাড়াও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির পরও যে নতুন পর্যায়ের আন্দোলন হয়, তারও সূত্রপাত বিদ্যাসাগর করেননি। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন—'১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ

ডিরোজিও শিষ্যগণ যে বেঙ্গল স্পেক্টেটার নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ভূত করা হয়।'

সে যাক, সূচনা যেখানেই হোক, সূত্রপাত যাঁর হাতেই হোক না কেন, বিধবা বিবাহের সত্যিকারের উদ্গাতা বিদ্যাসাগরই। তাঁরই হাতে এ আন্দোলনের সার্থক পরিণতি। এটি শুধু বাংলা দেশের জাতীয় ইতিহাসেই নয়, বিদ্যাসাগরের জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অদ্ভুজ শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত একটি পত্রে (৩১ শ্রাবণ ১২৭৭) বিদ্যাসাগর নিজেও স্বীকার করেছেন—'বিধবা বিবাহ আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।'

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন—'এক দিবস, কোন আত্মীয়ের স্বাদশ বর্ষীয়া দুহিতা বিধবা হইলে, তদ্দর্শনে জননীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ জননীকে সান্ত্বনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে, বিধবা বালিকার পুনর্বার বিবাহ বিধি কি ধর্মশাস্ত্রের কোনও স্থলে কিছু লেখা নাই? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন? জনক জননীর মুখ নিঃসৃত এই বাক্য তাঁহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল।'

এরপর থেকেই বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। বহু পুঁথির পাতায় মনোনিবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরাশরের বচনটি উদ্ধার করেন। এই বচনটিই হয় তাঁর এ আন্দোলনের একমাত্র শাস্ত্রীয় হাতিয়ার—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।

এই অমোঘ অস্ত্র হাতে নিয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী 'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' পুস্তিকা প্রচার করেন। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই বাংলাদেশে পক্ষ বিপক্ষের দুটি শিবির নির্মিত হয়। বাংলা দেশের সে সময়ের অবস্থাটি রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় বলতে গেলে—'শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দু সমাজ রূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল, এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে।'

এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের পক্ষে এলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। 'সংবাদ প্রভাকর' পক্ষ সমর্থন করলেও ঘোষণা করলেন—'বিধবা মাত্রেই বিবাহ করিবার অধিকারিণী হইতে পারেন না। তিনি একমাত্র অক্ষত-যোনিদিগের বিবাহের পক্ষপাতী।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিবাহের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এ বিবাহ সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরের (১লা মাঘ ১২৬৩) সম্পাদকীয়

প্রবন্ধে লিখলেন—'অগ্রে সোপান নির্মাণ না করিয়াই উপরে ঘর করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঘোড়ার সজ্জিত না করিয়াই চাবুক কিনিতেছেন। খাল খননের পূর্বেই সেতু বন্ধনের আড়ম্বর হইতেছে। এখনো ভাতের হাঁড়িতে জল চড়েনি, কিন্তু ঠাই করিয়া পাতুনির আঁটুনি বিলক্ষণ হইতেছে। ফলে প্রণিধান করুন স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ ইহার কোন্ বিষয়টি অগ্রে করা বিধেয় হইতেছে? আমার বোধে প্রথম ব্যাপারেই উপযুক্তরূপ যত্ন করা উচিত।' রাজা রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল তর্কলঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিরাও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

কিন্তু উৎসাহিত করারও লোক মিলল। এলেন পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতেরা। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' আরও উৎসাহিত করলেন—'হিন্দুগণ বিধবার বিবাহ নিমিত্ত কেবল কথার ধুমধাম না করিয়া যত্নপূর্ণ কার্যে দেখাইতে মনোযোগী হয়েন তবে অতি উত্তম হয়।'

ধনকুবের মতিলাল শীল, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন—যিনি বিধবা বিবাহ করবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘোষণা করা হল। প্রভাবশালী গ্রাণ্টসাহেব বললেন—যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন বিধবা বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত। চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা ভাল।

গুপ্তকবি মতামত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ রসিকতাও করতে শুরু করলেন—

শুনিয়া বিয়ের নাম 'কোনে' সেজে বুড়ি।
কেমনে বলিবে মুখে 'খুড়ি খুড়ি খুড়ি?'
পোড়া মুখ পোড়াইয়া কোন পোড়ামুখী।
'দুঃখী' 'সুখী' মেয়ে কেলে কেঁচে হবে যুকী?

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিদ্যাসাগর ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন। বিপক্ষ শিবির থেকে প্রচারিত পুস্তিকার জবাব দিলেন তাঁর বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ডে। বিপক্ষ শিবির থেকে তার জবাব মিলল না। বিদ্যাসাগর প্রমুখ আরও উৎসাহিত বোধ করে ভারতের বড়লাটের কাছে পেশ করলেন এক আর্জি। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। গ্রাণ্ট সাহেবের সুপারিশে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার কলভিনের সমর্থনে পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। গুপ্তকবি লিখলেন—

গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কাল বিল কাল বিল করিলেন পাশ॥

প্রতিপক্ষের বাধা তবুও কমল না। আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। বর হলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কনে অখ্যাত হলেও বর অখ্যাত সাধারণ নন। দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় 'সাহিত্য সবিতা শ্রীশ' সেই বিদ্যারত্ন মহাশয় ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুহৃৎ। মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—'তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।'

এ হেন বর, তারপর এ হেন বিবাহ!

রীতিমত বর সেজে বিয়ে করতে এলেন শ্রীশচন্দ্র। বরানুগমন করলেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ বাঙালী মনীষীরা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন শ্রীশচন্দ্রও বিপত্নীক ছিলেন।

বাংলা দেশে প্রথম বিধবা বিবাহ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ হল ঠিক পরের দিন। রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন—'দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ করেন পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ। তৃতীয় বিধবা বিবাহ ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ আমার জ্যেষ্ঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ ও সহোদর মদনমোহন বসু করেন।'

কিন্তু প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা কোনদিনই হয় নি। বিধবাবিবাহ বিধিসম্মত এবং অনুষ্ঠিত হবার পাঁচ বছর পরেও সংবাদ প্রভাকরে যে সব কবিতা প্রকাশিত হয় তাতে ব্যঙ্গের প্রকট মূর্তিটিই প্রকাশিত দেখা যায়। একজন কেরানীর বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত একটি কবিতা তার সাক্ষ্য—

শ্রুত মাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
বিধবার থালিরুম হইল ফিলাপ॥
ভাল ধর্ম, সুখরাজ্য, কার্য বটে পাকা।
কেরানীর কর্ম নয়, রুম খালি রাখা॥
ধামধুম টামধুম অন্ধকারে আলো।
হুম কোরে, উম পেয়ে, ঘুম হবে ভালো॥
জয় জয় কালধর্ম, আর কারে ভয়।
কাঁকু মঞ্চে, মাকুদেবী হোলেন সদয়॥

শুধু কি তাই, বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বহু টাকা ঋণ করতে হয়। এমন কি বীরসিংহ গ্রামে এজন্যে তিনি শেষ জীবনে একবার গ্রামবাসীর হাতে নিগৃহীতও হন। তবু বিদ্যাসাগর যে এ প্রথাকে মনেপ্রাণে কতটা শ্রদ্ধা করতেন, তা তাঁর শেষ জীবনের একটি পত্র থেকে জানা যায়। পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন; তখনও তিনি নারায়ণের বিধবাবিবাহ হয়েছে শুনে অনুজ শম্ভুচন্দ্রকে পত্র (৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৭) লেখেন—'নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।'

এ থেকে বোঝা যায় এ আন্দোলনকে কার্যকরী করতে তাঁর আন্তরিকতা কতটা গভীর ছিল। অবশ্য সহায়ের মধ্যে ছিল সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির সহযোগিতা এবং সাহচর্য।

কিন্তু সমাজে সহানুভূতি কম ছিল বলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরই প্রায় এ আন্দোলন বন্ধ হয়। বিধবা বিবাহের সমর্থক হিসেবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, স্বরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষীকে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এ প্রথা সমর্থন করলেও তাদের সমর্থন উদার ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া

কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।' (বঙ্কিমজীবনী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

তবে তাঁর সহানুভূতি যে ছিল তার প্রমাণ আছে অন্য উক্তিতে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কুন্দ সম্পর্কে তিনি একস্থানে বলেছেন—'তার অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, আমি কুন্দকে মারিতে পারিব না। সে বালবিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; সূর্যমুখীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে চিরসুখী করিয়া সমাজকে দেখাইব বিধবাবিবাহে অধর্ম নাই, অশান্তি নাই।' (ঐ)

দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গনারী নাটকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেও এ প্রসঙ্গে তাঁর সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—'যদি কুমারীরা ব্রহ্মচর্য করতে পারে না এই তোমার মত হয়ত বালবিধবারাও পারে না। তবে বিধবা বিবাহ প্রচলন কর।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যে এ প্রশ্নটি আস্তে আস্তে আবার বিচার বিতর্কের বিষয় হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী, রোহিনী, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের মাধবী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি এ প্রশ্নটিই তুলে ধরেছে সমাজ এবং সাহিত্যের সামনে।

কিন্তু সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি পরিবার ভিন্ন এ বিবাহ সাধারণ জন সমাজে খুব বেশি অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এ থেকেই বোঝা যায় বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে এ আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সার্থকতা লাভ করলেও বাংলা দেশের মানুষ প্রাণ দিয়ে এটি সমর্থন করে নি। পরবর্তীকালে যে কয়টি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বিধবা পত্নী মহারাণী বসন্তকুমারীর বিবাহ উল্লেখনীয়।

সহানুভূতি এবং সমর্থন থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বহু পরে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজের বিবাহকে তাঁদের পরিবারের প্রথম বিধবাবিবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—'বাবা আমায় কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে জ্ঞাতিভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বিবাহ হল ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে—আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিবাহ।'

কালের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। আজকের বাঙালী সমাজে বিবাহ সম্পর্কে কুসংস্কার জনিত বিধিনিষেধ যে আজ অনেক দূরীভূত হয়েছে তার মূলে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনেক অবদান আছে। একথা স্মরণ করলে আজও এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

বাঙলার লৌকিক নৃত্যধারা

অজিতকুমার মিত্র

বাঙলার লৌকিক চিত্রাংকণ রীতি মৌখিক সাহিত্য আর নানাপ্রকার সংস্কারের মতই লৌকিক নৃত্য ধারার বিবর্তনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সমবায়িক সংগীতের গীতরীতি গাথা গীতিকার রচনা, যৌথ লোক শিল্প ও লোক চিত্রের মতই লৌকিক নৃত্যধারা একান্তভাবেই গোষ্ঠী নির্ভর। এই নাচ সর্বাংশে অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। লোকদেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায়শ ক্ষেত্রে এই নৃত্যরীতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাচই অনেক পূজার বিশেষ অংগ। গান, নাচ বাদ দিয়ে লোকদেবতার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না।

অংকুরের ফুটে ওঠা আর প্রজননের কেলিক্রীড়ার মধ্যে যে আঘাত তার ভিতর আদিম ছন্দের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। প্রকাশের উন্মাদনায়, ব্যাকুলতায় নৃত্যরীতি বিকাশের সূত্র খুঁজে পায়। অন্বেষণের বিক্ষিপ্ত পদপাতের মধ্যে বাঙালীর নৃত্যধারা ছন্দোবদ্ধ হয়। সম্ভাবনার মধ্যে যে আলোড়ন তাই বাঙালীর নৃত্যভাবনা। ধর্মজিজ্ঞাসার আকুলি ব্যাকুলিতে নৃত্যের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। শস্য আর সন্তানের কামনা নৃত্যের ছন্দে ছন্দে দোলায়িত হয়ে ওঠে। বাঙালীর আদিম জীবনের গহনে এর সূত্র সন্ধান করতে হবে। লৌকিক নৃত্যে তাই জীবনের যৌনানুভূতি—দৈহিক ক্ষুধার লিপ্সা প্রজননের অভীপ্সা হয়ে দেখা দেয়। কেন না নাচের প্রতিটি মুদ্রায় দেহের আকর্ষণ প্রতি পদপাতে যেন কার জন্য কার টান আর এই নাচে কারু-কৃতির স্থূলতা সম্ভোগের বাসনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাই নাচের ছন্দে বাঙালী জীবন বিকাশ লাভ করে।

অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক বলে এই নৃত্যরীতি বিবর্তনহীন। প্রথম ক্ষেত্রে গোষ্ঠী পরম্পরাগত বলে কখনও বংশানুক্রমিক বা কখনও গুরু মুখাপেক্ষী তাই লৌকিক নৃত্যরীতির রূপ কল্পনা গণ্ডী নির্ভর। এই নাচের মধ্যে বাজনা নাচ আর গান পরস্পর সাযুজ্যবদ্ধ। নাচ গানের মধ্যে বাঙলার ঋতুর মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়। অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক নাচগুলি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রত্যেক নাচের সংগে প্রকৃতির সংযোগ রাখতে এবং প্রকৃতির ধারা অনুযায়ী এই নাচের গতিভংগী ছন্দায়িত। বর্ষার নাচে বৃষ্টির রূপায়ণ জলধারার সুর বজায় রাখবার চেষ্টা করে। শরতের নাচে সাদা কাশফুলের আর স্তিমিত তরংগ নদীর স্বচ্ছতার সুর জাগে। শীতের নাচের মধ্যে থরথরানি স্পষ্ট অনুভূত হয়। বসন্তের নাচে ফুলদোল অনুভব করা যায়। গ্রীষ্মের নাচে রুদ্রতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

চৈত্র বৈশাখ হতে গাজনের ভক্ত্যারা 'বেত' হাতে নৃত্য করে। মুখে তাদের ব্যোম ব্যোম ধ্বনি। নৃত্যের তালে তালে ঘন ঘন বেত সঞ্চালনের ছন্দে প্রকৃতির রুক্ষতা প্রকাশ পায়। আগুনের মাঝে নৃত্য করতে হয় ভক্ত্যাদের। নাচতে নাচতে পায়ে পায়ে আগুন নিভিয়ে ফেলার রীতি আছে। না হলে দেবতার রোষ গ্রামের অমংগল ডেকে আনবে। দুটী গরুর গাড়ী মুখোমুখী বেঁধে চার চাকার গাড়ী তৈরী করে সেই গাড়ীতে চার কাঠের ফ্রেম বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ফ্রেমের মাথার কাঠে পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় নীচু মুখে দুলতে থাকে ভক্ত্যা। হাতে বেলপাতা নিয়ে দুলাতে

দুলাতে জলন্ত আগুন পেরিয়ে শিব শিলার মাথায় পুষ্প দিয়ে আসে বার বার। দেবপূজার রুচ্ছতা থমথম করে চৈত্র শেষের আকাশে। এই দোলেরও ছন্দ আছে। গ্রামের মানুষ অনুষ্ঠানটিকে একরকমের নাচ বলে। বর্ষার আগমনের সাথে সাথে মনসার ঘট-বারি মাথায় নিয়ে ভর-নৃত্য করতে করতে দেয়াশী গ্রাম পরিক্রমা শেষে পূজা বেদীতে দেবীর ঘট বা দেবী বিগ্রহ স্থাপন করে। ভর-নৃত্যে নাকি দেবত্ব অনুপ্রবিষ্ট হয় ঐ দেয়াশীটার মধ্যে। বর্ষার শেষে রাধা অষ্টমীর দিনে সাত ভাইদের পূজায় ভর-নৃত্যের মধ্যে বাঘ মহিষ আর রাখাল নাচ অপূর্ব লৌকিক নৃত্যধারা সঞ্জীবিত রাখে। মনসার ভর-নাচে বর্ষার বিহ্বলতা প্রকাশ পায় আর বর্ষার শেষে ফসল রক্ষার আকুলতা দেখা যায় বাঘ মহিষ আর রাখাল নৃত্যে। লোক-দেবতারা উপোসী ভক্ত্যাদের মধ্যে ভর করে। কেউ বাঘের প্রেতাত্মায় উদ্দীপিত হয়। কেউ মৃত রাখালের ভূতে নেচে ওঠে। মহিষ ভূতের প্রেতাত্মা ভর করে অন্যদের। বাঘ খেতে চায় মহিষদের। রাখাল রক্ষা করতে চেষ্টা করে। আর মহিষরা বাঁচতে চায়। কৃষি নির্ভর আদিম জীবন হতে এই নৃত্যধারা বিকশিত। এই নাচের তালে তালে গান হয়।

সাত ভাইরা বাণাসিং
সতের শয়তান হরে
সাত বেগুণ জালির বন
সাতভাই খেলে জিয়ান সাত।
ছোট মুট জিয়ান কাঠি ভূমে লুটে যায়।
তাহারই তলে সাতভাই ঠাকুর খেলে
সাতভাই খেলে জিয়ান সাত॥

বলি দেওয়া ভেড়া ছাগলের রক্ত খেয়ে এই নাচ শেষ হয়। বর্ষার শেষে নৌকা বাইচের নাচেও অপূর্ব ছন্দ জাগায়। ভরা ভাদ্রে আদিবাসীদের 'ছাতা' পরবের যৌথ নৃত্যে কাশফুলের মেলার ছন্দ জাগে। হাত ধরাধরি করে নাচে মেয়েরা পায়ের তালে তালে শরীরের অংগ সঞ্চালনে কচি শস্তের নাচন জাগে কুমারী মেয়েদের যৌবনের তটে তটে। বাউলের নাচে উদাসী মনের হৃদয়পটে যেন অধর আকাশের নব রূপায়ণ। কোথায় পাবো তারে—ছন্দ এ নাচে। মংগলগান গায়কের গানের সংগে চামর হাতে নাচ অপূর্ব ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে। বাঙলাদেশের অনেক জেলায় যাযাবর জাতের কয়েক রকমের পূজারী নানা রূপের আভাষ এক ধারার মাতৃমূর্তি নিয়ে দুয়ারেদুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাদের গানের সাথে নাচের ছন্দ আছে। শরতের আকাশের মতই তা মধুর। মেয়েদের-শস্য রোপন উৎসবে নাচ ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শীতের আগমনের সূচনায় হরিনাম সংকীর্তনের আসরে, চব্বিশপ্রহর কীর্তনে, অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে গৌরনিতাই নাচ বাঙালীজীবনে নাচের উন্মাদনা জাগায়। খোলের তালে তালে রাধাকৃষ্ণ নাচ অপূর্ব ভক্তিরসের সঞ্চার করে। হরিনাম সংকীর্তনে দুটী কিশোরকে রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে হরিনামের দলের মাঝে নাচিয়ে বেড়ায়।

সেদিন যেমন গোপিনীর ঘরে
খেয়েছিলে হরি ননী চুরি করে!
তেমনি করে ও কালাচাঁদ
আর কি ননী খাবে না॥

একতাল খোলের বাজনা। এক তালেরই নাচ। নাচন জাগায় ধর্মপ্রাণ বাঙালীর মনে। শীতের প্রথমে পাখী বাহকের নাচ লৌকিক নৃত্যধারার অপূর্ব সংযোজন। প্রাচীন বাঙলায় ডাকাতের কালিপূজায় বলিদানের নৃত্য থেকে এক রকমের নৃত্য ধারার সৃষ্টি হয়। তার থেকে বলিদানের পর দেবী প্রদক্ষিণের নাচ এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। শীতের শেষে বাঙালী আদিবাসীদের মধ্যে পূজা অনুষ্ঠানে সমবায় নৃত্যরীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাদনা পরবে দিনের পর দিন যৌথ আদিবাসী নৃত্য মানুষকে পাগল করে তোলে। আদিবাসীদের 'এক্ষেন' দিয়ে নববর্ষের নাচে তাদের উদ্দাম করে তোলে। বসন্তের ফুল প্রভাতে বাঙালীদের বিয়ের নাচ বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়। দু পংক্তি গানের সংগে বাউরীদের বিয়ের নাচ মানুষকে মাতিয়ে তোলে।

সাঁইতের সরানে রাঙা ধুলোরে
সাঁইতের সরানে রাঙাধুলো।
যৈবুনবতীর পানে তাকায়
ওপাড়ার বাবুগুলোরে
ওপাড়ার বাবুগুলো॥

বিবাহ আসরে রাইবেশে নাচের রেওয়াজ আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই নৃত্য ধারাকে বাঙলার জমিদারেরা এককালে লালন করে এসেছে।

প্রতি পূজায় নানা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাচের রীতি বাঙালীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূজার ঢাকীর ঢাক সমেত নৃত্য, মৃদংগ বাদকের বাজনা বাজাতে বাজাতে নৃত্য, খোল বাদকের বোলের তালে তালে নৃত্য অপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করে। দেবী বিসর্জনের নাচ হয় প্রত্যেক গ্রামে। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ আজ পৃথিবী বিখ্যাত। পুতুল নাচ নাচাতে নাচাতে এক রকমের নৃত্য করতে হয় সূত্রধরকে। পূজা অনুষ্ঠানে আসর রাখবার জন্য ঝুমুর নৃত্য গানের তালে তালে মেয়েদের মধ্যে অপূর্ব নৃত্য ভংগীমার সৃষ্টি করতো। ভাদু গানে কুমারী নৃত্য একক নাচের অপূর্ব নিদর্শন। বোলান গানে মেয়ে বেশী পুরুষের গান গাইতে গাইতে নৃত্য লৌকিক নৃত্য ধারাকে বেগবান রাখে। গুলঞ্চ ফুলের মালার সজ্জায় সজ্জিত পুরুষদের পোষাকে অপূর্ব চাঞ্চল্য জাগায়। এমন কি ছাদ পিটুনিদের নৃত্যের তালে তালে নৃত্যের ছন্দ আনে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙলাদেশে একরকমের যাযাবর জাত কোন্ প্রাচীন কাল হতে জীবিকার সন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়ে। পুরুষদের পাখী মারা ব্যবসা। যুবতী মেয়েরা গ্রামের মধ্যে নাচে গানে উন্মাদনা জাগায়। লাস্যময়ী এই রমণীরা অনেক সময় যাদু দেখাবার জন্য গৃহস্থের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়। গানে গানে মাতিয়ে তোলে গ্রামীণ জনজীবনকে। বাংলাভাষী যাযাবর বাস্তুচ্যুত এই জনগোষ্ঠী জনজীবনে হাসি আনন্দের খোরাক জোগায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলে গলিত শব নিয়ে এক রকমের বীভৎস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। শকুনের ডানা ঝাপটানোর রীতি সে নাচে আদিমতার নক্কারজনক পরিবেশ। এই নাচের সংগে গানও গাওয়া হয়। কখনও কখনও একে কালকে পাতার নাচ বলা হয়।

রাঢ় বাঙলার বহু গ্রামে জিতাষ্টমীর অনুষ্ঠান হয় অত্যন্ত আড়ম্বরের সংগে। এই ষষ্ঠী পূজার

অনুষ্ঠানে ছোলা ভিজিয়ে রেখে অংকুরের কামনায় মহুয়া পাতা হাতে মেয়েরা যষ্ঠীকথা শোনে। কথা শুনতে শুনতে মহুয়া পাতা সমেত হাতটী কখনও মাটিতে রাখতে হয় কখনও উপরে তুলতে হয়। তাই হস্ত সঞ্চালনেরও তাল আছে। এই অনুষ্ঠানে জংগলে ফুল তুলতে যাওয়ার সময় কুমারী মেয়েদের হাত ধরাধরি করে যাওয়া ও রীতি বদ্ধ চলার গতি লৌকিক নৃত্যর রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু না। বহু ব্রত পালনে মেয়েদের এমনি নাচ আছে। বিভিন্ন ব্রতে বিভিন্ন নাচ। এমন কি শিশুদের খেলায়ও নাচ আছে। স্বাভাবিক নিয়মে এই নাচে ছেলেরা অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। কাউকে শিক্ষা দিতে হয় না।

বৃষ্টির প্রার্থনায় বাঙালী জীবনে লৌকিক নৃত্যধারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। বীরভূম জেলায় মতে নাচ বলে একরকম নাচ প্রচলিত আছে। এই নাচ মূলতঃ বাঙালী জীবনে বৃষ্টির প্রার্থনা। বৃষ্টির অভাবে ব্যাপক শস্যহানির আশংকা দেখা দিলে অন্ত্যজ জাতির কুমারী মেয়েরা নিশুতি রাতে উলংগ অবস্থায় দল বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে।

এই গ্রাম পরিক্রমারও এক রকম ছন্দ আছে। যাদু ইন্দ্রজালের উপর মানুষের আদিম বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লা ম্যাঘ দে পানি দের কাতর অনুনয় এই অন্ত্যজ কুমারীদের নাচে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকে একজন বর্ষিয়সী বৃদ্ধা উলংগ মহিলা। ঝাঁটা আর গোবর গোলা জলের হাঁড়ি হাতে ঐ বৃদ্ধা পথ চলে। পথে অকস্মাৎ কোন পুরুষের দেখা পেলে অকস্মাৎ গালাগালি দেবার রীতি আছে। ঐ গোবর গোলা জলও পুরুষের মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই নাচের অনুষ্ঠান করলে নাকি বৃষ্টি হবেই হবে। কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালী জীবনে ইন্দ্রজাল চিন্তা ও যাদু বিশ্বাসের প্রতি মোহ এইসব নাচে এখনও বেঁচে আছে। গ্রাম বাঙলায় প্রচলিত মাদার নাচও নাকি বৃষ্টির প্রার্থনা। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে বৈশাখ মাসের পনেরোর মধ্যে যে রবিবার পড়বে, সেই রবিবারের রাত্রে জলন্ত কুল কাঠের অঙ্গারের উপর নৃত্য করতে করতে ঐ আগুন নিভিয়ে ফেলার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মুসলমান ফকিররাই এই নাচের ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে। কোথাও একটি বাঁশ ঝাড়ে যদি কোন বাঁশ মাটি থেকে উঠে দুটি হয়ে যায় তাহলে মাদার নাচের জন্য ঐ বাঁশ দুটীকে সংগ্রহ করা হয়। একটি বাঁশকে রেখে দিয়ে অন্য বাঁশটিকে পোষাক পরিয়ে মাথায় নানারকম সাজ সজ্জা দেওয়া হয়। একমাসের উপর মাদার নৃত্য করতে করতে যে চাল পয়সা আদায় হয় তা দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ দিকে লোক খাওয়ানো হয়। এই গানে বাজনার বোল একই তালে বাজতে থাকে।

ধুম ধুম ধুম মাদার—
চেধুমাধুম ধুম ॥

একটি ঢোল আর কাঁসির বৈচিত্র্যহীন এক তাল বাজনা। বীরভূম জেলায় দাতাসাহেবের মেলার উরাস মাদার নাচ দেখালে মেলা কর্তৃপক্ষ মাদারের সম্মানে চাদর দান করে। এই নাচ একক নৃত্য হলেও দু'তিন জন মাদার নাচিয়ের যৌথ নৃত্য প্রয়াস বিশেষ আনন্দের হল্লোড় তোলে। বিরাট আকাশমুখী বংশ দণ্ডটি কখনও নাকের ডগায়, কখনও মাথায়, কাঁধে, কনুইয়ে, হাতের তালুতে দাঁড় করিয়ে রেখে মাদার নাচিয়ে ঢোলের তালে তালে নাচতে থাকে। অপূর্ব লৌকিক নৃত্যের অনবদ্য

নিদর্শন এই মাদার নাচ। আকাশমুখী প্রার্থনা যেন তপস্যা করে নানা কৃচ্ছ্রতায়। অনেকে বলে মাদার বক্স বলে একজন পীর নাকি এই নাচের প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া মাদার পীর বলে বাঙলাদেশে এক লৌকিক দেবতা আছেন। আগুনের রোষ থেকে তিনি মানুষকে রক্ষা করেন হয়তো বৃষ্টির অমৃত বর্ষণে। এখনও অনেক গ্রামে গ্রামবাসী মানুষেরা মাদার পীরের উপাসনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ধানীজমি উৎসর্গ করে।

লোক-সংগীতের মতই লৌকিক নিত্য ধারার নিজস্ব একটা সুর আছে যেন। আদিম কালের কোন প্রভাতে এই নাচগুলির প্রবর্তন হয়েছিল কেন না গোষ্ঠী নির্ভর সমাজে একক জীবনের অসহায়তা যখন মানুষকে বিপদসংকুল করে তোলে তখনই সমাজ-বিন্যাসের প্রথম স্তরেই যৌথ-নৃত্যের প্রবর্তন হয়। তাই এই নাচগুলির বৈচিত্র্যহীনতা কোন অভাব সৃষ্টি করেনি। প্রত্যেকটি নাচে বিভিন্ন বাজনা আছে। এই সব লৌকিক নাচে সাধারণতঃ ঢোল, খোল, কাঁসি, ঢাক, মৃদংগ বাজনা বাজে। কাঠির তালে তালেও অনেক নাচ দেখানো হয়। গ্রামকে জানতে হলে, মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে জানলাভ করতে হলে এই নৃত্যধারার জানলাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। নাচে নাচে প্রাচীন বাঙলা মূর্তর ছিল। নাচের আনন্দে প্রাণের জোয়ার উছল গতি-তরংগে লৌকিক জীবনধারাকে গতিশীল রেখেছিল।

মতে নাচ—১৩৭৮ সালের আষাঢ় মাসে বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে সংঘটিত হয়। বৃষ্টির প্রার্থনায় মতে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

মাদার নাচ—রাঢ় বাঙলার অনেক গ্রামে মাদারের থান আছে। বীরভূম জেলায় অনেক গ্রামে মাদার নাচ দেখানো হয়। বীরভূম জেলায় সেকেন্ডা-মকদমনগরে মহম্মল আলি একজন মাদার নাচিয়ে।

সাতভাইয়ের নাচ—বীরভূম, সাঁওতাল পরগণায় রাধা অষ্টমীর আগের দিনরাত্রি হতে সাতভাই পূজা বা ভূতপূজা অনুষ্ঠিত হয় অনেক ঝোপঝাড়ে ঘেরা ভূতুরে থানে।

অনুষ্ঠানে ছোলা ভিজিয়ে রেখে অংকুরের কামনায় মহুয়া পাতা হাতে মেয়েরা যঞ্জীকথা শোনে। কথা শুনতে শুনতে মহুয়া পাতা সমেত হাতটী কখনও মাটিতে রাখতে হয় কখনও উপরে তুলতে হয়। তাই হস্ত সঞ্চালনেরও তাল আছে। এই অনুষ্ঠানে জংগলে ফুল তুলতে যাওয়ার সময় কুমারী মেয়েদের হাত ধরাধরি করে যাওয়া ও রীতি বদ্ধ চলার গতি লৌকিক নৃত্যর রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু না। বহু ব্রত পালনে মেয়েদের এমনি নাচ আছে। বিভিন্ন ব্রতে বিভিন্ন নাচ। এমন কি শিশুদের খেলায়ও নাচ আছে। স্বাভাবিক নিয়মে এই নাচে ছেলেরা অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। কাউকে শিক্ষা দিতে হয় না।

বৃষ্টির প্রার্থনায় বাঙালী জীবনে লৌকিক নৃত্যধারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। বীরভূম জেলায় মতে নাচ বলে একরকম নাচ প্রচলিত আছে। এই নাচ মূলতঃ বাঙালী জীবনে বৃষ্টির প্রার্থনা। বৃষ্টির অভাবে ব্যাপক শস্যহানির আশংকা দেখা দিলে অন্ত্যজ জাতির কুমারী মেয়েরা নিশুতি রাতে উলংগ অবস্থায় দল বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে।

এই গ্রাম পরিক্রমারও এক রকম ছন্দ আছে। যাদু ইন্দ্রজালের উপর মানুষের আদিম বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লা ম্যাঘ দে পানি দের কাতর অনুনয় এই অন্ত্যজ কুমারীদের নাচে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকে একজন বর্ষিয়সী বৃদ্ধা উলংগ মহিলা। কাঁটা আর গোবর গোলা জলের হাঁড়ি হাতে ঐ বৃদ্ধা পথ চলে। পথে অকস্মাৎ কোন পুরুষের দেখা পেলে অকস্মাৎ গালাগালি দেবার রীতি আছে। ঐ গোবর গোলা জলও পুরুষের মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই নাচের অনুষ্ঠান করলে নাকি বৃষ্টি হবেই হবে। কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালী জীবনে ইন্দ্রজাল চিন্তা ও যাদু বিশ্বাসের প্রতি মোহ এইসব নাচে এখনও বেঁচে আছে। গ্রাম বাঙলায় প্রচলিত মাদার নাচও নাকি বৃষ্টির প্রার্থনা। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে বৈশাখ মাসের পনেরোর মধ্যে যে রবিবার পড়বে, সেই রবিবারের রাত্রে জলন্ত কুল কাঠের অঙ্গারের উপর নৃত্য করতে করতে ঐ আগুন নিভিয়ে ফেলার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মুসলমান ফকিররাই এই নাচের ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে। কোথাও একটি বাঁশ ঝাড়ে যদি কোন বাঁশ মাটি থেকে উঠে দুটি হয়ে যায় তাহলে মাদার নাচের জন্য ঐ বাঁশ দুটিকে সংগ্রহ করা হয়। একটি বাঁশকে রেখে দিয়ে অন্য বাঁশটিকে পোষাক পরিয়ে মাথায় নানারকম সাজ সজ্জা দেওয়া হয়। একমাসের উপর মাদার নৃত্য করতে করতে যে চাল পয়সা আদায় হয় তা দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ দিকে লোক খাওয়ানো হয়। এই গানে বাজনার বোল একই তালে বাজতে থাকে।

ধুম ধুম ধুম মাদার—
চেদুমাধুম ধুম ॥

একটি ঢোল আর কাঁসির বৈচিত্র্যহীন এক তাল বাজনা। বীরভূম জেলায় দাতাসাহেবের মেলার উরাস মাদার নাচ দেখাতে মেলা কর্তৃপক্ষ মাদারের সম্মানে চাদর দান করে। এই নাচ একক নৃত্য হলেও দু'তিন জন মাদার নাচিয়ের •যৌথ নৃত্য প্রয়াস বিশেষ আনন্দের হুল্লোড় তোলে। বিরাট আকাশমুখী বংশ দণ্ডটি কখনও নাকের ডগায়, কখনও মাথায়, কাঁধে, কনুইয়ে, হাতের তালুতে দাঁড় করিয়ে রেখে মাদার নাচিয়ে ঢোলের তালে তালে নাচতে থাকে। অপূর্ব লৌকিক নৃত্যের অনবদ্য

নিদর্শন এই মাদার নাচ। আকাশমুখী প্রার্থনা যেন তপস্যা করে নানা কৃচ্ছ্রতায়। অনেকে বলে মাদার বন্য বলে একজন পীর নাকি এই নাচের প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া মাদার পীর বলে বাঙলাদেশে এক লৌকিক দেবতা আছেন। আগুনের রোষ থেকে তিনি মানুষকে রক্ষা করেন হয়তো বৃষ্টির অমৃত বর্ষণে। এখনও অনেক গ্রামে গ্রামবাসী মানুষেরা মাদার পীরের উপাসনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ধানীজমি উৎসর্গ করে।

লোক-সংগীতের মতই লৌকিক নিত্য ধারার নিজস্ব একটা সুর আছে যেন। আদিম কালের কোন প্রভাতে এই নাচগুলির প্রবর্তন হয়েছিল কেন না গোষ্ঠী নির্ভর সমাজে একক জীবনের অসহায়তা যখন মানুষকে বিপদসংকুল করে তোলে তখনই সমাজ-বিজ্ঞানের প্রথম স্তরেই যৌথ-নৃত্যের প্রবর্তন হয়। তাই এই নাচগুলির বৈচিত্র্যহীনতা কোন অভাব সৃষ্টি করেনি। প্রত্যেকটি নাচে বিভিন্ন বাজনা আছে। এই সব লৌকিক নাচে সাধারণতঃ ঢোল, খোল, কাঁসি, ঢাক, মৃদংগ বাজনা বাজে। কাঠির তালে তালেও অনেক নাচ দেখানো হয়। গ্রামকে জানতে হলে, মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে জানলাভ করতে হলে এই নৃত্যধারার জানলাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। নাচে নাচে প্রাচীন বাঙলা মুখর ছিল। নাচের আনন্দে প্রাণের জোয়ার উছল গতি-তরংগে লৌকিক জীবনধারাকে গতিশীল রেখেছিল।

মতে নাচ—১৩৭৮ সালের আষাঢ় মাসে বীরভূম জেলার ডুবরাজপুরে সংঘটিত হয়। বৃষ্টির প্রার্থনায় মতে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

মাদার নাচ—রাঢ় বাঙলার অনেক গ্রামে মাদারের থান আছে। বীরভূম জেলায় অনেক গ্রামে মাদার নাচ দেখানো হয়। বীরভূম জেলায় সেকেন্ডা-মকদমনগরে মহম্মদ আলি একজন মাদার নাচিয়ে।

সাতভাইয়ের নাচ—বীরভূম, সাঁওতাল পরগণায় রাধা অষ্টমীর আগের দিনরাত্রি হতে সাতভাই পূজা বা ভূতপূজা অনুষ্ঠিত হয় অনেক ঝোপঝাড়ে ঘেরা ভূতুরে থানে।

বৈষ্ণব-কবির নিসর্গ-কল্পনা

দেবনাথ দাঁ

নিসর্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্য একালের কবিদের যতখানি মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছে, সেকালের কবিদের তেমন নয়। আমাদের সেকালের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মভিত্তিক ও দেবতানির্ভর। পুরোনো ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা ধর্ম-চিন্তায় ও দেবতার অনুধ্যানে এতখানি নিমগ্ন ছিলেন যে, মানব-মনের সুখদুঃখের আলোছায়া এবং প্রকৃতি-জগতের বিচিত্র শোভা-সৌন্দর্য তাঁদের চিত্তলোকে সেভাবে ছায়াপাত করতে পারেনি। মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলীর এখানে ওখানে দু'চার চরণ প্রকৃতির ছবি আছে অনস্বীকার্য, কিন্তু বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যেখানে প্রকৃতি-বর্ণনা স্থানলাভ করেছে। দেবতার কর্তৃত্ব স্বীকার না করলে মানুষের ভাগ্যে কি নিদারুণ সর্বনাশ নেমে আসে তা দেখবার জন্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টির অবতারণা করেছেন। তাছাড়া মানুষের জগতকে যেহেতু ঘিরে রয়েছে প্রকৃতি, সেই কারণে সাহিত্য থেকে প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব। শ্রীরাম যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য গোদাবরী তীরের পঞ্চবটী অরণ্যে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাস জীবন অতিবাহিত করেছেন, তখন অরণ্যের গাছপালা পশুপক্ষীর অল্পস্বল্প কথা আপনি কাব্যে এসে যায়।

কিন্তু আরো পুরানো সংস্কৃত সাহিত্যে নিসর্গ-সংসারের স্থান এতখানি সঙ্কুচিত ছিল না। প্রকৃতি মানুষের স্বভাব-চরিত্রে কি অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে, কালিদাসের শকুন্তলা নাটক তার আশ্চর্য নিদর্শন। তা ছাড়া কেবল প্রকৃতি নিয়েই যে কাব্য লেখা চলে ঋতুসংহারে কালিদাস তা দেখিয়েছেন। পুরানো বাংলা সাহিত্যের কবিরা কালিদাসের কাব্য ও নাটক থেকে অনেক কাহিনী, অনেক অলঙ্কার নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিঃসীম প্রকৃতি-অনুরাগকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। তবু আমাদের পুরাতন সাহিত্য, বলছিলাম, একেবারে প্রকৃতি-চিত্র বর্জিত নয়। আবার প্রকারে ও পরিমাণে বৈষ্ণব কবিতাই এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব কবিতার কাব্যকুঞ্জে কত যে কোকিলের কলকণ্ঠ শুনেছি তা স্মরণ করা কঠিন। সেখানে একদিকে আছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, অন্যদিকে কে জানে কতো নামহীন খ্যাতিহীন কবি। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীতে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে পল্লবগ্রাহিতা ও গতানুগতিকতা। বৈষ্ণব কবিতাতে প্রকৃতির স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা প্রথমোক্ত কবিদের কাব্য থেকেই চরণ চয়ন করব। তাতে নিসর্গচিত্রণে উৎকর্ষের দিকটা চোখে পড়বে। যেখানে কেবল পল্লবগ্রাহিতা ও গতানুগতিকতা তার কেবল ঐতিহাসিক মূল্যটুকুই স্মরণীয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মেঘমেদুর বাদল-প্রকৃতির পাগল ছবি একটু বেশী চোখে পড়ে। বর্ষা অবশ্য কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, ঋগ্বেদের কাল থেকে ভারতীয় কবিমানসে গভীরভাবে ছায়াপাত করে আসছে। বর্ষা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম ঋতু। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার এবং মাথুর পদে কবিরা নিবিড় বর্ষাপ্রকৃতির দুরন্ত উল্লাস ও অফুরন্ত সমারোহকে রূপায়িত করেছেন। মেঘান্ধকার বর্ষানিশীথের ভীষণ রমণীয়তাকে বিদ্যাপতি নীচের পংক্তিগুলিতে কি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন :

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরত দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার ॥

বর্ষারাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকার, তার প্রচণ্ড মেঘগর্জন ও মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-বিস্ফুরণ কবিতাটির শব্দ-চয়নে ছন্দ-বিন্যাসে ও চিত্রাঙ্কণে কি ভাবে না ধরা পড়েছে। অভিসারের একটি পদে গোবিন্দদাস লিখেছেন :

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥

সেই পথে অভিসারিকা শ্রীরাধা পা দিতেই বর্ষার দিগন্ত ব্যাপী সুদীর্ঘ ঝটিকা-প্রবাহ তাঁকে লুপ্ত করে নিল :

তঁহি অতি দুরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥

ঝড়ের বেগে উৎক্ষিপ্ত সেই বৃষ্টিধারার প্রচণ্ডতা সরে যেতে কবি বললেন :

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥

কিন্তু বলতে না বলতেই :

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥

অভিসারের পদে বর্ষাপ্রকৃতির এই মনোরম চিত্রসৌন্দর্য কিন্তু কবিদের বিশুদ্ধ প্রকৃতি অনুরাগের বসে আসে নি, এসেছে শ্রীরাধার দুঃখজয়ী প্রেমের অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্য। অবাধ্য সন্তানের শতসহস্র অত্যাচারকে জননী যখন হাসিমুখে সহ্য করে, সেইখানেই তার গৌরব। উতলা মাধবী রাত্রে কিংবা শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দয়িতের জন্য পথে নামা এমন কঠিন নয়, কিন্তু প্রেমের জন্য যে শ্রাবণের দুর্যোগকে উপেক্ষা করতে পারে, বজ্র-বৃষ্টি সর্পভীতি যার গতিকে রোধ করতে পারে না, তার প্রেমের তুলনা কোথায় ?

মাথুর পদে বর্ষা-বর্ণনা এসেছে প্রধানতঃ, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের পরিভাষায়, উদ্দীপন বিভাব রূপে। ষড়ঋতু আপন পুষ্পপর্ণাভরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়কে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে। বর্ষার ঝড়-জল-অন্ধকারের এমন একটা আবেদন আছে যা আমাদের বিরহবেদনার গোপন উৎসটিকে এক মুহূর্তে অবারিত করে দেয়। মেঘদূতের কবি লিখেছেন :

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

প্রাকৃতে-অপভ্রংশে লেখা প্রকীর্ণ কবিতাতেও আমরা মেঘ দেখে বিরহী নায়িকাকে অশ্রুমোচন করতে দেখেছি :

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা
দিট্ঠা মেহা জলে সমলা।
নচ্চে বিজ্জু পিঅ সসিআ
আবে কংতো কহ কহিআ॥

বিদ্যাপতির 'ই ভর বাদর মাহ ভাদর' নামক বিশ্রুত পদটি ভারতীয় কবিতার এই ধারা অনুসরণ করেই বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা দিয়েছে। রূপময়ী প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্যের পানে তাকিয়ে শ্রীরাধার দীর্ঘশ্বাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও আছে :

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥

বর্ষা মানুষকে কেন কাঁদায় তার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষা, কেকাধ্বনি, শ্রাবণ-সন্ধ্যা ইত্যাদি রচনাতে। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাকে স্বীকার করলে বলতে হয়, যদিও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্যই কবিরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তবু তাঁদের মনোলোকে প্রকৃতি—সামান্য হলেও—নিজের মায়াময় প্রভাব বিস্তার করতে একেবারে ছাড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে কোথাও কোথাও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের স্বপ্নসুন্দর নর্মলীলার পটভূমিকাতে রয়েছে যমুনা-তীরের মধুময় নিসর্গসংসার —কোথাও তার নিবিড় তমাল অরণ্য, কোথাও বিকশিত কদম্বকুঞ্জ। বর্ষার মেঘকজ্জল রাত্রে সে অরণ্য শ্রীরাধাকে অভিসারে ডাক দেয়, শরতের জ্যোৎস্নামাখা স্বপ্ন-যামিনী আভীর কন্যাদের পাগল করে তোলে। প্রকৃতির রূপমাধুরীকে প্রকাশ করার যে অবকাশ আছে বৈষ্ণবপদাবলীতে, সকল কবি কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃতি-বর্ণনা কৃত্রিম এবং গতানুগতিক। রাসলীলা পদে শরতের বর্ণনায় নরোত্তম লিখেছেন :

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী॥

পটভূমি হিসেবে প্রকৃতির বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতা ব্যতীত মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যেও পাওয়া যাবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার সব বর্ণনা গতানুগতিক নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় মাঝে মাঝে এমন দু'চার ছত্র পাওয়া যায় যা এক মুহূর্তে আমাদের অন্তরে বর্ণময় সৌন্দর্যের আগুন জালিয়ে দেয়। এই রাসলীলারই পদে গোবিন্দদাসের চরণ স্মরণ করুন :

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরিল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর ভোরনি।

রাসলীলার অন্য একটি পদে গোবিন্দ দাস লিখছেন :

কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি।
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি॥

এই রকম পংক্তি রচনা করা আজকের দিনের কোনো কবির পক্ষেও গর্বের বিষয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতিকে আর পাওয়া যায় অলঙ্করণের ক্ষেত্রে। ঘরের নিশ্চিন্ত সুখ ছেড়ে পথে নামার দুঃখ বোঝাতে গিয়ে চণ্ডীদাস বলেছেন :

গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাঝে।
কুল পানি ফল কাঁটায় সকল
সলিল লাগিয়া আছে॥

এখানে শ্যাপলা-পানায় ভরা নিত্য পরিচিত পল্লী পুষ্করিণীর ছবি আমাদের চোখের ওপর ভেসে উঠে। সন্ধ্যার কালো অন্ধকারের পটে গৌরবর্ণা শ্রীরাধার উজ্জ্বল রজতকান্তি লক্ষ্য করে বিদ্যাপতি লিখেছেন :

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহার গেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

উপমান হিসেবে প্রকৃতি চিত্রণও আমাদের সাহিত্যে প্রথানুগত পদ্ধতি।

সে যাক, পুরোণো বাংলা সাহিত্যে যেখানে প্রকৃতির স্থান নিতান্তই সঙ্কুচিত, সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃতি বর্ণনাকে উপেক্ষা করার নয়। সেকালের বাঙালী কবিরা হয়তো একালের কবিদের মতো সাক্ষাৎভাবে নিসর্গ সৌন্দর্যের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন নি, কিন্তু অধ্যাত্মরস নিমগ্ন অন্তরেও যে কখনো কখনো প্রকৃতি তার মায়াময় যাদুস্পর্শ অন্ততঃ কিছুটাও বিস্তার করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ কী? আবার এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতার দাবী মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য অপেক্ষা কিছু বেশী।

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সামঞ্জস্য (ধর্ম:/৬) ॥

অনুশীলন বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যসাধনের কথা এখানে বলা হয়েছে। সামঞ্জস্য বলতে সবগুলি বৃত্তিরই একপ্রকার বৃদ্ধি নয়। যে বৃত্তিগুলির যে পরিমাণ বৃদ্ধির দরকার সেগুলিকে সেইপ্রকার সুযোগ দান করা। ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে উচ্ছেদ করা উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোধেরও প্রয়োজন। তাই ক্রোধেরও সীমিত অনুশীলন দরকার। তবে এগুলি নিকৃষ্ট বৃত্তি। ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিরই সম্যক অনুশীলন করা উচিত।

সামঞ্জস্য ও সুখ (ধর্ম:/৭) ॥

সামঞ্জস্যসাধনের আলোচনায় দেখা গেছে যে কতকগুলি চিত্তবৃত্তির যেমন অধিক অনুশীলন দরকার, তেমনি কতকগুলি আবার অল্প অনুশীলন প্রয়োজন। কিন্তু কোনগুলি অধিক এবং কোনগুলি অল্প প্রাধান্য পাবে তা বিচার করা একটি সমস্যার বিষয়। এই বিচারের মাপকাঠি হল সুখ। সুখদায়িনী ক্ষমতাই হল বৃত্তিগুলির সার্থকতা। কিন্তু সুখও আছে তিনপ্রকার—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখস্পৃক্ত, ক্ষণিক—কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখটিকে সুখই বলা যায় না। প্রথমটিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ বৃদ্ধি হয় সেগুলিরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

সাংখ্যদর্শন (বি: প্র:/১ম) ॥

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন'—১২৭৯ সালের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা এবং ১২৮০ সালের বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যা।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কপিলের সাংখ্যদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য বঙ্কিম প্রবন্ধমধ্যেই ব্যক্ত করেছেন—'সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাহিত্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।'

সাংখ্যদর্শন বহু প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের পূর্বে ইহা রচিত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলি নিহিত রয়েছে। বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের বিষয় এবং এগুলিও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি কিভাবে সাংখ্যদর্শনকার উপস্থিত করেছেন, বঙ্কিম তার বর্ণনা দেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পার্থক্যের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য—'ইউরোপীয়েরা শক্তি অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না পরকালে হইব কি না,

তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।'

সাংখ্যদর্শন যে অনেকাংশে বাস্তবভিত্তিক, একথা স্বীকার করতেই হবে।

সুখ কি ? (ধর্ম:/২) ॥

সুখের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে অনুশীলনী বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশই সুখ, অপরপক্ষে বলা যেতে পারে যে সুখেই অনুশীলন ধর্মের সার্থকতা। প্রসঙ্গক্রমে অনুশীলন ও অভ্যাসের পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। অনুশীলন হল স্বাভাবিক শক্তির অনুগামী, কিন্তু অভ্যাস অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক শক্তির বিপরীত। আবার সাধারণ দৃষ্টিতে সুখের স্বরূপ ভেদও আছে। একজনের কাছে যে জিনিষটি সুখের আর একজনের কাছে তা সুখের নাও হতে পারে।

সুবর্ণগোলক (লোকরহস্য) ॥

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৪২০—২২।

'সুবর্ণগোলক' রচনাটিতে একটি কাহিনীর মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। কৈলাশশিখরে একদিন হর-পার্বতী একটি স্বর্ণগোলক বাজী রেখে পাশা খেলতে আরম্ভ করেন। পার্বতী সুবর্ণগোলকটি জিতে নিয়ে পৃথিবীতে ফেলে দেন—মনুষ্যসমাজে এটির কি ক্রিয়া হয় দেখার জন্যে। মহাদেব বললেন—এর ফলে তাঁদের সৃষ্ট নিয়মের রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটবে।

এদিকে মর্ত্যে—কালীকান্ত বসু, রামা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চলেছে। কালীকান্তবাবু পথে সুবর্ণগোলকটি পেয়ে রামাকে লুকিয়ে রাখতে বললে। তার ফলে কালীকান্তবাবুর বৈশিষ্ট্য রামাতে সঞ্চারিত হল এবং রামাচাকর হয়ে গেল কালীকান্তবাবু। শ্বশুরবাড়ীতে এসে উভয়ের বিপরীত আচরণে বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হল। এদিকে আবার রামার কাপড় থেকে গোলকটি পড়ে গেলে বাড়ীর কর্তা নীলরতনবাবুর হাতে সেটি দিল তরঙ্গি। অমনি নীলরতনবাবু কোঁচার খুঁটটি মাথায় দিয়ে স্ত্রীসুলভ লজ্জা প্রকাশ করতে লাগল। এমনিভাবে যখন চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে তখন মহাদেব গোলকটির বিশেষ গুণ সম্বরণ করলেন।

এই গল্পের মাধ্যমে বঙ্কিম মানুষের প্রকৃত স্বরূপও আমাদের কিছুটা দর্শন করিয়েছেন। তাই মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন—'হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম।'

সুভদ্রাহরণ (কৃ: চ: ৪) ॥

মহাভারতে আছে অর্জুন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং তাতে কৃষ্ণের পরোক্ষ সম্মতি ছিল। এই ঘটনাটির দ্বারা অনেকে কৃষ্ণকে অন্যায়কারী বলে মনে করেন। কারণ বর্তমান দৃষ্টিতে জোর করে কন্যাহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা ও তাকে সমর্থন করা অত্যন্ত অসামাজিক কাজ। কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে যে বিবাহের এইসমস্ত আচরণবিধি নির্ণয়ের কারণ হল সমাজের

শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কৃষ্ণ যেহেতু জানেন যে অর্জুন ও সুভদ্রার মিলনে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নেই তখন তিনি সেই কাজে সম্মতি দান করেছেন। তবে অনেকে বলতে পারেন যে বিবাহটি অন্যায় নয়, বিবাহের পদ্ধতিটিই অন্যায়। কিন্তু এ বিষয়ে দেখা যায় বিবাহের বহু পদ্ধতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও অনেকরকমের বিবাহ পদ্ধতি আছে। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে আবার রাক্ষসবিবাহ অর্থাৎ কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা গৌরবের। সেদিক থেকে অর্জুন বীরোচিত কার্য করেছেন। ফলে সুভদ্রাহরণজনিত ঘটনায় কৃষ্ণের কোন দোষই ঘটে নি।

সূচনা [প্রচার] (পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'প্রচার' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ.—১-৬।

'প্রচার' পত্রিকার প্রথমে সম্পাদকের নাম না থাকলেও এটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগিতায় প্রকাশিত পত্রিকা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; অন্যত্র তিনি লিখেছেন—'নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়।' (আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়)। এই পত্রিকা প্রকাশের সময় তিনি সূচনাংশে পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। প্রচার একটি ছোট পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ তাঁর মতে বড় পত্রিকা সকলে সবটা পড়ে না। এই পত্রিকায় নামকরণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'সত্য, ধর্ম' এবং 'আনন্দের' প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম। এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।' এই পত্রিকায় বঙ্কিমের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সূচনাংশে বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও মূল্যবান দু'চারকথা বলেছেন।

স্ত্রীলোকের রূপ (কঃ দঃ/৮ম সংখ্যা) ॥

'স্ত্রীলোকের রূপ' রচনাটি ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়। বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

রচনাটি কমলাকান্তের নামসাদৃশ্যে দপ্তরে স্থান পেলেও, ভাবসাদৃশ্যে বঙ্কিমমানসের সঙ্গে পার্থক্য আছে।

লেখক এখানে স্ত্রীলোকের রূপের গরবের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি প্রকৃতিজগতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। যেমন ময়ূর ময়ূরী অপেক্ষা সুন্দর, সিংহ সিংহী অপেক্ষা সুন্দর, বৃষ গাভী অপেক্ষা সুন্দর। সবশেষে তিনি রূপের অসারত্বের কথা চিন্তা করে, প্রকৃত রূপ দেহে নয় গুণে—এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দপ্তরের রচনার অনেকক্ষেত্রেই হয়তো গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি রচনাভঙ্গীতে যে সাবলীলতা ও লঘুতা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, এই রচনাটিতে তা দুর্লভ। লেখক এখানে যেন গুরুতর প্রবন্ধের মতই প্রতিপাদ্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

হনুমদ্বাবুসংবাদ (লোকরহস্য) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন'—মাঘ, ১২৮৯, পৃ. ৪৭১—৭৫।

এদেশে ইংরেজীয়ানায় দক্ষ বাবু সমাজের সার্থক প্রতিচ্ছবি আছে রচনাটিতে। এইসমস্ত বাবুরা মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজী ভাষাতেই কথাবার্তা বলাকে গৌরবের বলে মনে করেন।

এঁদের কাছে ইংরেজ আগমন—স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ। ইংরেজের কাছে পরাধীনতা ভোগ করেও এঁদের ধারণা তাঁরা ইংরাজের কাছেই স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছে। হনুমান এবং এক বাবুর কথোপকথনের দ্বারা রচনাটি পরিচালিত হয়েছে।

হরিবংশ (কৃঃ চঃ ১/১৬) ॥

হরিবংশে আছে যে এই গ্রন্থ মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু কত পরবর্তীকালে রচিত সে বিষয়ে কোন নিঃসংশয়িত প্রমাণ নাই। গ্রন্থমধ্যবর্তী অনেক ঘটনাও পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে হয়। তাই মহাভারতের ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয়ে হরিবংশের সাক্ষ্য না দেওয়াই ভাল।

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস (কৃঃ চঃ ৫/৭) ॥

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় এসে বিদুরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। পরদিন তিনি কৌরব রাজসভায় গিয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে বললেন। কিন্তু দুর্যোধন সেকথা না শুনে কৃষ্ণকে আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ সেকথা জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে তিনি ইচ্ছা করলে একাই দুর্যোধনের শাস্তিবিধান করতে পারেন, কিন্তু তা করবেন না। তবে দুর্যোধন যেন সাবধান হয়। এখানে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানর ঘটনা যে বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। এটি প্রক্ষিপ্ত।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা

পৃথিবীর কাব্য ও কবিতা-চর্চার ইতিহাস যতদূর জেনেছি আমরা, দেখেছি তাতে অধিকাংশ কবিই সিদ্ধির পথটিকে চিনে নিয়ে একবার সেই পথেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতার শেষ পরমাণুটি উজার করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ সেই একই সিদ্ধির পথে চিরকাল দিগ্‌ভ্রমণে উৎসাহবোধ করেছেন। একমাত্র তাঁরই কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে আমরা সবিস্ময়ে দেখছি পরীক্ষা নিরীক্ষার নব নব প্রয়াস ও প্রেরণা, যার ফলে তাঁর কাব্য প্রৌঢ় বয়সের প্রান্তে এসেও যৌবনের স্বপ্নে বিভোর, তারুণ্য ও দুঃসাহসিকতার দীপ্তিতে প্রাণবন্ত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার বিষয়টি যার সূচনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর, আমার মনে হয়, যেন মনোলোকের অরণ্যেরই কমল। নূতন সৃষ্টির আনন্দময়, রসঘন বিরল অভিব্যক্তি। এও একধরণের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বা কোন অজানা অচেনা কাব্য ভূগোলের সীমান্ত আবিষ্কার।

নবসীমান্তেরই আবিষ্কার। সন্দেহ নেই। কিন্তু কোদালের মুখে হঠাৎ গুপ্তধন বেরিয়ে যাবার মতন দৈবিক ব্যাপার এ নয়। নয় হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্তের কোন রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কোন আকস্মিকতার আলপথ বেয়ে আসেনি এই প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। হয়তো এসেছে সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে যাকে কবি দীর্ঘকালের সাধনায় করেছেন পরিতৃপ্ত। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্বতীপরমেশ্বর মিল সংঘটন, সুখী সহবাসের সম্ভাবনা ও সুযোগ আনয়ন, বলাবাহুল্য কবির কোন আকস্মিক খেয়ালমাত্র নয়। পঞ্চক এ হলো তাঁর দীর্ঘদিনের পরীক্ষার পরিণতি। প্রচেষ্টার প্রাণময় উদ্যোগ পরিচালিত কর্মকাণ্ড যা তিনি দিয়ে গেলেন সমকালীনদের হাতে। সমকালীনদের তত নয়, উত্তরসূরীদেরই দিয়ে গেলেন উত্তরাধিকার।

কবি অনেকদিন থেকেই অনুভব করছিলেন, কাব্যের ছন্দোবদ্ধ সুদৃঢ় অবয়বের মধ্যে চিন্তাধারায় একটা স্বাভাবিক সরল প্রবাহ আনবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা হয়েছে ছন্দের প্রাচীর প্রান্তরে গভীরবদ্ধ সীতারূপী কাব্যলক্ষ্মীকে মুক্ত করে অনন্ত আকাশের তলে, অনুভূতির অনাবিল বাতাসে অবারিত করে দেবার। অশোকবনের অমোঘ প্রহরা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবার যদিও ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ নানা ছন্দের সমারোহকে লঙ্কাদ্বীপের অনার্যসম্ভূত চেরীদল বলে মনে করতেন না কখনো। কখনোই ছিল না তাঁর ছন্দ সম্পর্কে তেমন অকৃপি অগ্রজ মধুসূদন যাকে প্রকাশ করেছেন মিত্রাক্ষর নামক দুর্লভ সনেটটিতে, যার প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া থেকে প্রবর্তন করেছেন অমিত্রাক্ষর। বিদ্রোহ আছে মধুসূদনের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী নন। অতৃপ্তিবশে, প্রতিক্রিয়ার প্রেরণায় নয় কাব্যে তাঁর গদ্য ছন্দের প্রবর্তন। আমারতো মনে হয়, চিরনতুনত্বের প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের এ আরেক আবির্ভাব। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রণয়িনী কবিতাকে আরেক আবির্ভাবে সম্মোহিত করেছেন।

কিন্তু এই সম্মোহন পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই। যদিও রঙ্গমঞ্চের যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে অভাবিত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে যায় সহসাই তবু ভুললে চলবে না যে ঐ সহসা উদ্ভাসেরও নেপথ্যে রয়েছে এক সুদীর্ঘকালেরই সঞ্চয়, অনেক দিন ও রাত্রি পরিশ্রমের দাদন। কাব্যে গদ্যছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল বলাকা পর্ব থেকেই। বলাকাতে প্রথম তিনি ছন্দ স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্তন করেন। এখানেই তাঁর চিন্তার প্রথম মৌলত্ব, স্বকীয়তার সমারোহে অনিবার্য কাব্যমূর্ছনায় ধরা দিয়েছে। কিন্তু দ্বিধাহীন এখানেও হতে পারেন নি কবি তেমন দুঃসাহসিকরূপে। ভেঙে ফেলতে পারেন নি ছন্দের গঠন সম্পূর্ণভাবে। এখানেও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে অন্তমিল ও ছন্দের ফল্গুপ্রবাহ। রয়ে গেছে অন্তর্লীন হয়ে। রুদ্র আবির্ভাবও অন্ত্যমিলের রুদ্ধতাতেই হয়েছে অভিব্যক্ত—

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধতারা, মুগ্ধতারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁদ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

পূরবী ও মহুয়াতে—১৯২৫ ও ১৯২৯-তে যাদের রচনা—সেখানেও কবিগুরু পুনরায় ছন্দের কৌলীন্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অর্থাৎ নূতনকে আহ্বানের লগ্ন তখনো অনাগত হয় নি তাঁর কাছে। প্রস্তুতির আরও কিছু বাকী তখন পর্যন্ত।

তারপর ১৯৩২ সাল। কবি প্রকাশ করলেন তাঁর পুনশ্চ। পুনশ্চতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাব—বাংলাকাব্যে এ এক যুগান্তর বলেই মনে হয় আমার। বিষয় নির্বাচন, ছন্দবিন্যাস—এই দু'দিক দিয়েই পুরাতনের সঙ্গে সবপাট চুকিয়ে দিয়ে, খুলে ফেলে দিয়ে পুরাতনের জীর্ণ নির্মোক বেরিয়ে এলেন নবীন রবীন্দ্রনাথ; আরেক মেঘের পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন তরুণ সূর্য। দেখা দিল আলোক। 'সঙ্গীতের আবেগমুক্ত' নির্মোক, 'বক্তব্য বিষয়ের গৌরবের উপর নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান। নিরাভরণ পৌরুষের প্রতীক।' এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কবিতাকে তিনি উপহার দিলেন তাঁর পাঠক-পাঠিকা, অনুরাগী-অনুরাগিণীর কাছে।

পুনশ্চর ভূমিকাতে লিখলেন 'গদ্যছন্দের সুস্পষ্ট অক্ষর না রেখে……বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা' এটাই তাঁর পরীক্ষাধীন বিষয়। তাছাড়া 'পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সম্বন্ধ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাকে দূর করে গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরন স্বাভাবিক করাও তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথা পুনশ্চর কয়েকটি কবিতাতেও অভিব্যক্তি পেয়েছে। পুনশ্চর প্রথম কবিতা কোপাই-এ তিনি কোপাইর 'জলে স্থলে, তরুণে শ্যামলে' গ্রন্থিবদ্ধ গতিছন্দে তাঁর নবপ্রবর্তিত কাব্যছন্দের প্রতীক আবিষ্কার করেছেন। কবির মতে, এখানে "ভাষার গান" ও "ভাষার গৃহস্থালী" সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য স্বীকার করে নিয়েছে অনায়াসে। এর জন্য কী চাই, তা-ও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে—

একে অধিকার যে করবে
তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকমের গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ,
গুরু লঘু নানাভঙ্গীতে।

ভাবীকালের ইচ্ছে ও রুচির দিকে দৃকপাত করেই অন্তঃপুরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীকে পথিকবধূর ধূলি-ধূসর বেশ পরিয়েছেন কবি। শেষ সপ্তকের ২০, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক কবিতাতে তিনি নূতন কাব্যাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নবযুগের কবি 'কঠিন চিত্ত' 'উদাসীনের' গান গাইবেন। ছন্দবদ্ধ কবিতাতে রয়েছে আভিজাত্যের সুথাসনে সংহত হৃদয়াবেগ। মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ নয়। তা যেন টবের গাছ। আর ছন্দহীন কাব্য হলো মাটির সঙ্গে দৃঢ়মূল। যথেচ্ছ বিস্তৃত। এ যেন বনের আসল সম্পদ ঐশ্বর্যে এবং সৌন্দর্যের স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত রসে ভরপুর। কবি মনে করেন, 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস……' এই বিশ্বাসে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৩) ও শ্যামলী (১৯৩৬) যার মধ্যে তাঁর গদ্যকবিতার অধিকাংশ সংগৃহীত।

পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যের প্রায় সব কবিতাই গদ্যাশ্রিত। যথার্থ গদ্যকবিতার লক্ষণ হলো বিষমাত্রিক যতি, অসমছন্দ সম্পদ এবং গদ্যোচিত বাগভঙ্গি। এইসব এসব সংকলনের কবিতায় এসেছে। গদ্যের সঙ্গে গদ্যকবিতার তফাৎ পংক্তি সাজাবার ভঙ্গিতে নয়, প্রধানত ছন্দের দোলে এবং অপ্রধানত বাগভঙ্গিতে। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গদ্যকবিতার ছন্দ। গদ্যছন্দ বাক্যার্থকে অনুসরণ করে। তার যতি পড়ে বাক্যের পর্বে যেখানে অর্থের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর সাময়িক বিরাম। এতে পর্বের মধ্যে তাল বা মাত্রার সমতার প্রশ্নই ওঠে না। গদ্যছন্দ অনুসরণ করে মাত্রার বা তালের সমতাকে, যেখানে বিরাম আছে নির্দিষ্ট মাত্রার বা তাল পরিমাপের পর। বৃদ্ধ মাত্রা সমতা না থাকলেও পর্বের মধ্যে তালের রেশ অনুভূত হয়। অর্থাৎ গদ্যছন্দ অতিতাল, পদ্যছন্দ সমতাল এবং গদ্যকবিতার ছন্দ হলো বিষমতাল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টায় পরিচয় রয়েছে লিপিকার প্রথম অংশে। পদ্যের মত পংক্তি ভেঙে ছাপা না হলেও এগুলির মধ্যেই যে গদ্যকবিতার ঝংকার রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় বাংলা গদ্যকলার শক্তি দূর প্রসারিত হয়েছে। পুনশ্চর গদ্যকবিতাগুলিতে রেখাচিত্রের যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও ভাবের যে বলিষ্ঠ প্রভাব ফুটে উঠেছে তা' গদ্যকবিতাতে হলে ছন্দের বর্ণবহুল ঐশ্বর্যে ভাষায় পেলবতায় ও হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। কিন্তু গদ্যকবিতাতে বলে তেমনটি হয় নি।

এবারে দেখা যেতে পারে এই গদ্য কবিতার কত রকমের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। সুবিধাজনক শর্তে আমরা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য কবিতাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে

যে কবিতাগুলিকে ফেলা যায় তার মধ্যে রয়েছে আখ্যায়িকা জাতীয় ব্যালে ধর্মী কবিতা। তার লক্ষণ সুরের হাল্কাভাব ও কল্পনার অর্ধনাটকীয়তা। কতকগুলি আবার মনের ক্ষণিক আবেগ ও আকস্মিক খেয়ালকেই ধরতে সচেষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি কল্পনার উচ্চস্তরে বাঁধা। গদ্যের বিশ্বব্যাপী প্রসার দার্শনিকতার উচ্চবেদীতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলিতে আছে বিশ্বপ্রকৃতি, সৃষ্টিরহস্য, গ্রহনক্ষত্রাদির অমোঘ নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ কক্ষ পরিক্রমণ ইত্যাদির কথা। তৃতীয় শ্রেণীতে যে কবিতাগুলিকে ফেলেছি তাতে ধ্বনিত হয়েছে চিরন্তন সুর। সীমা অসীম, খণ্ড অখণ্ড, রূপ অরূপের উপলব্ধি সঙ্গত কবিতা। চতুর্থ শ্রেণীতে আছে প্রেমের চিরন্তন রহস্য সম্পর্কে কবির মনোভাবের কবিতা। আর পঞ্চমতম শ্রেণীতে আছে আর্ট ও জীবন সমস্যার উপর কবির প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার কথা। এই সাধারণ শ্রেণী বিভাগ থেকেই আমরা বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যকে।

পুনশ্চর—অপরাধী, ছেলেটা, সহযাত্রী, শেষচিঠি, বালক, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে ও প্রথম পূজা ; শেষ সপ্তকের—বৃদ্ধ ডাকাত, নেহাল সিং-এর আত্মদান ; শ্যামলীতে —কবি, দুর্বোধ, অমৃত ও বঞ্চিত মূলতঃ ফাঁকে ফাঁকে কাব্যরস মেশানো গল্পবিবৃতি। শ্যামলীর— বিদায় বরণ ও হারানো মন মেঘখণ্ডের মত লঘু, ভাসমান মুহূর্তের ভাব—ঝলকের প্রতিচ্ছবি। এক সুদুর্লভ স্বর্গালোক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গদ্যকাব্যে কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতি আপনা আপনি উদ্ভূত হয়…। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতি মাধুর্য, অতি লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না।' কবি অনুভব করেছেন যে তাঁর গদ্য কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি অপর কোনরূপে প্রকাশ করতে পারতেন না। অলংকৃত গদ্যরীতির মাধ্যমে উচ্চতম কাব্যোৎকর্ষে পৌঁছানো যায়। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের গল্প, বাইবেলের অনুবাদ, যজুর্বেদের উদাত্ত গদ্যমন্ত্র ও গীতাঞ্জলির গদ্যঅনুবাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

ভালো কথা। কিন্তু কোমলে কঠিনে মিলে যে এক নূতন, সংযতরীতির উদ্ভব তিনি প্রত্যাশা করেছেন বস্তুত তা' উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে সিদ্ধির সীমান্তে গিয়ে সম্ভবতঃ পৌঁছায় নি। তারপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র মননশীলতা ও দর্শনপ্রবণতাও মনে হয় তাঁর কাব্যছন্দেই অনেক স্বতোৎসারিত এবং পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতির স্বপক্ষে ওকালতি করে যে সব কথা বলতে চেয়েছেন, বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে একথাই বলতে পারি যে সেগুলি যে সময়ের রচনা তখন গদ্যপদ্যের মূলগত ব্যবধান এভাবে ধরা দেয় নি। বাইবেলের মধ্যে গদ্য থাকা সত্ত্বেও তুচ্ছতম আখ্যায়িকার মধ্যেও গম্ভীর মৃদঙ্গনাদের মত একটা সঙ্গত ধারা প্রবাহিত। গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের মধ্যেও আছে এমন একটি গতিছন্দ একটি অচল প্রবাহমানতা।

ছন্দই হলো কবিতার প্রাণ-তার নিয়ত হৃদস্পন্দন। তাকে ভেঙে ফেলে যথেচ্ছভাবে বৈচিত্র্যপ্রয়াস দেখানো চলতে পারে। কিন্তু হৃদস্পন্দন বন্ধ হলে যেমন দেহ টেঁকে না, মৃত্যুই হয় তার অনিবার্য নিয়তি তেমনি একবারে ছন্দকে পরিহার করে কাব্যচর্চার কথা চিন্তা করাও বাতুলতামাত্র। যার প্রমাণ যত্রতত্র নজর করা যায় অত্যাধুনিকদের কাব্যচর্চায়।

পুরোপুরি ছন্দবর্জিত কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্যর্থ। ব্যর্থ ডান। ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের

অনাভরণ কাব্যও যে খুব সার্থক হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তাঁর গদ্যকবিতার মধ্যেও যেগুলি সার্থক হয়েছে যথা—শ্যামলীর—ছুটি, গানের বাসা ও পয়লা আশ্বিন ; পুনশ্চর—শিশুতীর্থ ইত্যাদি তাদের মধ্যে আমরা একটা ছন্দ প্রবাহ অনুভব করে ধন্য হই এবং প্রধানতঃ এইজন্যই তাদের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য গড়ে উঠেছে। এই কবিতাগুলিতে চিত্রের সমাবেশ ও ভাবব্যঞ্জনা একটি কেন্দ্রস্থ রসকে ফুটিয়ে তুলেছে। অনাবশ্যকের প্রক্ষেপে কবি অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি তাদের। "ছন্দ যে শক্তিশালী কল্পনার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি—তা সে যতই ক্ষীণ ও দুর্নিরীক্ষ্য হউক"—তা' এইসব কবিতাগুলি পড়লেই ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশ্বজনীনতা, কালজয়ীতা, শাশ্বতনবীনতা যে কাব্যে সবচেয়ে বেশী সংবৃত্ত, সংযোজিত, যুথচারী তা' হলো তাঁর ছন্দবদ্ধ কবিতাতেই। সংযমের সম্ভ্রমে রবীন্দ্রকাব্য সেখানে মনোমুগ্ধকারী। গদ্যকবিতাতে যেখানে ছন্দের বন্ধন রয়েছে প্রায়শই সেখানেই তাঁর কবিতার সুদীর্ঘসঞ্চারী প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে আমাদের রসিক মনে এবং/অথবা আমরা ভালোবেসেছি ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথকেই যিনি আমাদের ভূতকালের, বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের যাবতীয় ছন্দকে আপন প্রতিভার আসনে সংযত সবল করে দিয়েছেন তাঁর বহুকথিত অনিত্যতার কপালে নিত্যতারই জয়তিলক পরিয়ে॥

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

স মা লো চ না

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট পেণ্টিং॥ রজতানন্দ দাশগুপ্ত। ডি. বি তারাপোরেবালা সন্স এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই, ১৯৭২, [ইংরাজী] মূল্য : ৮০৲ টাকা।

কোম্পানী ড্রয়িংস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী॥ মিলড্রেড্ আর্চর। হার ম্যাজেস্টিস ষ্টেশনারি অফিস, লণ্ডন, ১৯৭২ [ইংরাজী]

বীরভূমের যম পট ও পটুয়া॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা, কলিকাতা ; ১৯৭২, মূল্য : ৪৲ টাকা॥

ভারতের চিত্রকলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সাধারণ পরিচিতি ভিত্তিচিত্রের সম্পর্কে। এর মধ্যে অজন্তার চিত্রকলা, বাঘ গুহাচিত্র প্রভৃতি নানারূপ পদ্ধতির মাধ্যমে বহুল প্রচারিত। ক্রমশঃ মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিত্রধারা, বিশেষতঃ পশ্চিমভারতের রাজস্থান ও গুজরাটের ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থালেখ্য, মুঘল ও দখনী চিত্রধারা ও বর্ণসমুজ্জ্বল পাহাড়ী ধারার সম্পর্কে চিত্ররসিকের দৃষ্টি পড়েছে।

সুদূর দক্ষিণের ভিত্তিচিত্র ও পুথিচিত্রণ বিষয়টি আলোচিত হতে চলেছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে। ইতিমধ্যে ভারতীয় গ্রন্থালেখ্য অবলম্বন করে কয়েকটি সুপ্রচলিত বক্তব্যের একাধিক পথসৃষ্টি হয়েছে। একপথের পথিকজন চিত্ররচনার ভাবাদর্শ ও ভাবগত রূপায়নের বিশ্লেষণ করে থাকেন। ভারতীয়ত্বের আবরণে চিত্রায়ন হয়ে ওঠে সাহিত্য বিচারের পর্যায়ভুক্ত। যেখানে চিত্রকর থাকেন প্রচ্ছন্ন ও শিল্পকর্মের অন্তরালে সেখানে অনেক সময়ে রঙ ও রেখার ও সংস্থাপনের দ্বারা আঞ্চলিক শৈলী বা পৃথকীকৃত কলমের অনুসন্ধানে সময় ব্যয়িত হয়। এর স্বাভাবিক ফললাভ হয় হাতেনাতে। প্রবহমান ধারাপথের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি গাছ পাথরের আড়ালে অথবা শুষ্ক পথরেখার জরাজীর্ণ ঘাটে-আঘাটায় স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পশৈলীর অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বকে মানসিক স্বীকৃতি দান করা হয় মাত্র। মুঘল প্রভৃতি এবং রাজদরবারের জানিত ও প্রমাণিত শিল্পীদের আশ্রয় করে চিত্রালোচনা কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন তর্কের মল্লশালায় পরিণত হয়। চিত্রকে রসসৃষ্টিরূপে দেখা হয় না আলোচনার অরণ্যে। সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে গণ্য হয় না চিত্রের অবদান।

পূর্বভারতীয় চিত্রকল্প ও চিত্রায়ণের সামগ্রিক মূল্য নির্দেশ উপরে বর্ণিত প্রথাসমূহের প্রাবল্যে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। নিদর্শনের অপ্রতুলতা, কালগত ধারাবাহিকতার অভাব বিচ্ছিন্ন নিদর্শনের উপস্থিতি ও শিল্পকর্মের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ও এক সাধারণ পটভূমিতে রক্ষিত মূল্যায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

ঠিক এ অবস্থায় অধ্যাপক রজতানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রম। একটি অনাদৃত ও অনালোচিত বিষয়ে আলোকপাতের সম্ভাবনার জন্য এই রচনাটি সুরসিক পাঠককে উৎসাহিত করতে সক্ষম। এতে প্রধানতঃ বৃহৎ ভিত্তিচিত্রকে বাদ দিতে হয়েছে। কারণ ক্ষুদ্রায়তন

গ্রন্থালেখ্যই পূর্ব ভারতে মধ্যকালীন ও মধ্যপর্বের অন্তিম যুগের অধিকাংশ সময়ে সাংস্কৃতিক পটভূমিকে প্রায় অধিকৃত করেছিল। পূর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে এ ধারার চিত্রের অবদান কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। ভূমিকা ও প্রাক্‌কথনের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে লেখক তাঁর সমগ্র বক্তব্য বিষয়ের বর্ণীকৃত উপস্থাপন করেছেন বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, কোচবিহার, ওড়িশা—এই চারটি অধ্যায়ে। এর 'বিহার' অধ্যায়টি বিশেষিত 'বৌদ্ধ উত্তরাধিকার' দ্বারা। আসামের পর্বটি আঞ্চলিক চিত্রশৈলীর দ্বারা এবং ওড়িশার অংশটি রীতিগত মিশ্রণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত ও চিহ্নিত। গ্রন্থের শেষ দুটি অধ্যায়ে চিত্ররচনা পদ্ধতির বর্ণনা ও পূর্ব-ভারতীয় রাগচিত্রের প্রকৃতিগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা প্রকাশিত।

পালযুগের প্রাচীন চিত্রধারা যে ভৌগোলিক প্রাঙ্গনে উত্থিত ও প্রসারিত হয়েছিল সেটি প্রাচীন পূর্ববারতের বা প্রাচ্যের বর্তমানকালীন বঙ্গীয় ভূভাগ, বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে গ্রথিত করেছে একসূত্রে। এ সময়ের চিত্রনিদর্শন এসেছে কাগজ ও তালপত্রের পুঁথির প্রত্যক্ষ নিদর্শনের দ্বারা এবং আন্ততোষ চিত্রশালার বিখ্যাত তাম্রপট্টের অগভীর অঙ্কনের সূক্ষ্ম রেখানির্দেশের আসনাসীন বিষ্ণু মূর্তির পরোক্ষলব্ধ উপাদানে। পালযুগীয় যে চিত্রকলা বৌদ্ধ মানসিকতা তথা মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতিকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে সেটি সঙ্গত কারণেই সমগ্র অঞ্চলটির সম্পদ এবং নেপালস্থিত কাঠমাণ্ডু উপত্যকার অবদান ও উত্তরাধিকার থেকে এটিকে আলাদা করার প্রয়াস প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিকতার নামান্তর মাত্র। অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারিমিতা, পঞ্চরক্ষা প্রভৃতি পুঁথির চিত্রকলায় একটি বিশিষ্টভাব ফুটে উঠেছে অলঙ্কৃত 'রঞ্জনাক্ষর' দ্বারা বিভিন্ন পার্শ্ব ও মধ্যবর্তী স্থানকে আবৃত করে চিত্রসংস্থাপনের পদ্ধতির সাহায্যে। রেখা এখানে ঐতিহ্যগতভাবে 'ক্লাসিকাল' কিন্তু প্রকাশগতরূপে ছান্দসিক ও প্রসঙ্গ অনুসারে সংস্থাপনের তাল ও মিল অন্বেষণ করতে রত। এতে একই সময়ে বিষয়ঘটনাগত চিত্রায়ণের স্বাভাবিক প্রয়াস এবং মধ্যযুগীয় রীতির চিত্রানুবাদ সূক্ষ্ম অঙ্কন ও অনুপাতের সাহায্যে নিখুঁতভাবে প্রকাশিত।

বিহার অঞ্চলে ও বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে স্থানীয় চিত্রধর্মের বিকাশ মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক ব্যবস্থার উত্তরভারতীয় রাজনৈতিক সামাজিক যোগসূত্রের দ্বারা পুঁথির পাটায় ও পত্রস্থিত চিত্রাবলীতে মূলতঃ পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতের যমুনাতটবর্তী অঞ্চল এবং পূর্ব ও মধ্যপূর্ব রাজস্থানের প্রভাব কোথাও স্তিমিত কোথাও অবদমিত, কোথাও বা সোচ্চার ও প্রকটিত ছাপ রেখেছে পূর্বভারতের চিত্রকলায়। এটি মূলতঃ সম্ভবপর হয়েছিল দুটি কারণে। তীর্থ পরিক্রমণ চক্রের দ্বারা উৎপন্ন জন সংযোগ ও সংস্কৃতি সমন্বয় এর মধ্যে অন্যতম। চিত্ররূপের প্রত্যক্ষ অবদানের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসককুলের অনুগৃহীত যমুনাতীরবর্তী সওদাগর সম্প্রদায় এবং রাজপুত সৈনিক রাজকর্মচারীদের প্রাচ্যমুখী অভিযাত্রী হয়ে ক্রমশঃ বসতিকারী ও পরে ভূম্যধিকারীতে পরিণত হবার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব-ভারতের চিত্রকলায় পশ্চিমী ধারার ছাপ এনে দিতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একটু গভীরে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রাচ্যদেশের চিত্রকলার স্বকীয়তার উৎস স্থানীয় লোকযানের মধ্য দিয়ে।

আন্ততোষ চিত্রশালা ছাড়া বিষ্ণুপুরের একাধিক পুঁথির পাটায় এই সমর্থন লাভ করা যাবে। আবার অন্যদিকে পার্শ্বগতি এবং তীক্ষ্ণমক সমন্বিত মুখভঙ্গি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের

পাটায় ধরা পড়েছে ওড়িশার একটি চিত্রপ্রভাব। এ প্রসঙ্গে আন্ততোষ চিত্রশালার পাটাগুলি অধিকতর ব্যবহৃত। তবে বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের নিদর্শনসমূহ আরও গভীরতর মূল্যনির্ণয় করার যে যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তিম অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের পূর্বীয় চিত্রের ক্ষেত্রটি জটিল। মধ্যযুগের শেষপাদের মুর্শিদাবাদ শৈলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানের নানান পর্যায়ের পাটা, কাগজে আঁকা পট, রথের ফলকের ছবি, পুজা দালানের বা ইমারতের দেয়ালে আঁকা ছবি, মুঘলধারার অপভ্রংশ ইউরোপীয় প্রথায় মিশ্রিত ও প্রভাবিত ছবি এবং লোকচিত্র এ সমস্তই আলোচনার যোগ্য। এ ছাড়া আছে হাতীর দাঁতের পাত, অভ্রের পাত এসবের ওপর আঁকা ছবি, পাটনার চিত্র শৈলী, দেশজ ভাব প্রকাশক কিন্তু ইউরোপীয় চিত্র পদ্ধতির প্রচলনের কথা।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কোচবিহারের যে চিত্রসম্ভার আমাদের সম্মুখে এনে দিয়েছেন তার পর্যালোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। অসমীয় চিত্রধারার সঙ্গে এই চিত্রের রীতিগত প্রভাব প্রকটিত হয়েছে সাধারণ দেহ সংস্থানের সাদৃশ্যযুক্ত রূপায়ন পদ্ধতিতে। তবে এই ধারার ভূষণ ও ভঙ্গি পশ্চিম ভারতের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় অল্পাধিক পরিমাণে। যদিও বিষ্ণুপুরস্থ পাটাচিত্রের অনুশীলন ও রূপায়নের সূক্ষ্ম কলা বিন্যাস এতে খানিকটা পরিমাণে অনুপস্থিত।

শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় রূপকল্পনায় প্রস্ফুটিত বৈষ্ণব ধর্ম পুস্তকের অভ্যন্তরে ও আবরণীতে অসমীয় চিত্রকলা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের অসমীয় ক্ষুদ্রায়তন চিত্রকলার অধ্যায়টি সুলিখিত এবং কোচবিহারের মতই চিত্রালোচনার জগতে এখনও উপেক্ষিত। অষ্টমঙ্গলা, গোবিন্দস্তুতি, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অসমীয় চিত্রের পরিচয় লাভ করা যায়। এর মধ্যে স্বকীয়তায় ও বৈশিষ্ট্যে 'হস্তিবিদ্যার্ণব' পুঁথি এবং অহোম শাসনের প্রথম যুগের পঞ্চদশ শতকস্থ 'ফুং চিন' গ্রন্থের চিত্রকলা অন্যতম। অসমীয়া চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষিত লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বিশিষ্ট দেহরেখ কলার বিকাশে এবং উত্তর পূর্বের সংযোগ পথে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন চিত্রধারার প্রভাবেও সংযোগে। এই অঞ্চলের চিত্রে একদিকে যেমন পূর্বভারতীয় পুঁথি চিত্রণের তরঙ্গভঙ্গের খিলানকে প্রয়োজনমত প্রসারিত করে নিয়ে নিজে দেহরূপায়ণের সাহায্যে চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তেমনই অন্যদিকে চিত্র-মাধ্যমের উত্তর-পূর্বের স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি যথেষ্ট সহজে বোধ্য ও আদিম উপজাতীয় সারল্য-মণ্ডিত প্রাণশক্তির সবলতা দর্শনীয়। এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার সম্ভাবনা থেকে আজকের চিত্র দর্শককে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত হবে না। কারণ উত্তর পূর্বের বিশিষ্ট পটভূমিতে উপজাতিদের উপস্থিতির সাংস্কৃতিক বিচার আজও সম্পূর্ণ নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় চিত্রে বিশেষ করে 'আসাম রাজ্য সংগ্রহশালার' ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও অল্পাধিক 'লব-কুশের যুদ্ধ' পুঁথিটিতে লক্ষণীয়ভাবে পূর্বভারত তথা নেপালের ঐতিহ্য প্রকাশক ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায় পশ্চিম ভারতীয় বেশভূষা ও আদবের। কিন্তু অন্যভাবে আসাম সরকারের 'ঐতিহাসিক ও প্রাচীনকালীন অধ্যয়ন বিষয়ক বিভাগে'র 'তীর্থ কৌমুদী'র সম্ভরণকারীদের চিত্রে স্থানীয় আদিমতার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে অমিশ্রিত এবং অমলিন থেকেছে। আবার সবুজাভ পটভূমিতে শ্বেত অক্ষরে লিখিত ভাগবত গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের চিত্রটিতে ছাপ পড়েছে মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ভারতপ্রাচ্যের ও নেপালের বিশিষ্ট রীতির।

লেখক পূর্বভারতীয় চিত্ররচনার ক্ষেত্রে কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের যে সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন এবং যে ধরণের নূতন নিদর্শনাদি আমাদের রসিকজনের দৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন করেছেন সেটি অশেষ ধন্যবাদের যোগ্য। কিন্তু বিহারের পুঁথিচিত্রের বিবরণে ও ওড়িশী চিত্রের কথায় তাঁর সেই পারদর্শিতা সমপর্যায়ের দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে অসমর্থ থেকেছে। এর মধ্যে বিহারের মধ্যযুগীয় ও তার শেষপাদের চিত্রকলার অধিকাংশ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় অবহেলিত ভাবে পড়ে আছে। আবার উত্তর বিহারের নেপাল সংলগ্ন ও তৎপার্শ্ববর্তী মৈথিল অঞ্চলের পুথি চিত্রকীর্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। ওড়িশার চিত্রকলার প্রাচীনতর নিদর্শন সমূহ কেবলমাত্র স্থানীয় সংগ্রহে নয় অন্ধ্রদেশ সংলগ্ন বিভিন্ন পুস্তকভাণ্ডারে লক্ষ্যণীয় বলে অনুমান করতে বাধা নেই। তালপত্রে খোদিত রেখাপাতের দ্বারা সৃষ্ট ছবি কখনও অনলঙ্কৃত বৈথিক কুশলতায় কখনও রেখার সাহায্যে নির্মিত কক্ষাবলীতে রঙের আরোপে বর্ণাঢ্য।

প্রাচ্য ভারতের চিত্ররচনা পদ্ধতির বিবরণে নিয়োজিত গ্রন্থশেষের অধ্যায়টি লেখকের পরিশ্রম নিষ্ঠা ও সততার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কাঠের পুথির মলাট, আসামের 'অগর' বৃক্ষের বল্কল 'সাঞ্চীপাত', বিভিন্ন প্রকারের কাগজ, তুলট কাগজ, তালপত্র, মুগার কাপড় প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'সাঞ্চীপাত' প্রণয়ন পদ্ধতি, হরিতালরঞ্জন ও গন্ধক ধূপায়ন বা 'ফিউমিগেশন' এর প্রথা, বাঁশের পাত ব্যবহার, নাগেশ্বর বা 'নাহর' বৃক্ষের পাতা বা 'অলপাত' প্রভৃতির ব্যবহার ও শিবসাগরে ব্রহ্মদেশীয় পুথি সদৃশ অধিক লাক্ষা আরোপিত পুথির উল্লেখ প্রশংসাযোগ্য। কালি তৈয়ারীর রীতি, রঙ ও রঞ্জকদ্রব্য তৈয়ারী করার পদ্ধতি ও স্বর্ণাভ রঙ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় সংগ্রহকারী ও সংরক্ষণবিদদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। 'কাপ ঢেকিয়া' লেখনী, ভূটানে লভ্য 'হেমশিলা'র খড়ি, বাঁশের ভিতরে রক্ষিত মাটি পোড়ান পোড়ামাটির লেখনী এসব লেখকের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত।

পুস্তকে চারটি, বহুবর্ণরঞ্জিত ছবির পৃষ্ঠায় প্রধানতঃ অসমীয় চিত্রকলার নিদর্শন আছে। এক বর্ণ ছবির সংখ্যা প্রায় একশত। লিখিতাংশের ব্যাখ্যামূলক রেখাচিত্র একাদশটি। এক কথায় চিত্রনিদর্শনের ক্ষেত্রে পুস্তকটি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

পূর্বভারতীয় চিত্ররীতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে প্রকাশ করার উপযুক্ত প্রয়াস এতদিন হয়নি। সেদিক থেকে অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। আশা করব যে তিনি যেন শিল্পরসিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করে অবিলম্বে পূর্বভারতীয় চিত্রের আরও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও উপলব্ধিসহ বর্তমান পুস্তকের আর একটি সংস্করণ প্রকাশার্থ প্রস্তুত হতে সমর্থ হবেন।

ইতিপূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওড়িশা এবং প্রাচীন বাংলার চিত্রকলার পূর্বভারতীয় রীতি ও অবদান সম্পর্কে নান্দনিক ও শিল্পশৈলীগত সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করে বিশিষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট পূর্বভারতীয় চিত্রের পরিণত নির্বাচক, সংগ্রাহক, কালনির্ণয়কারী শিল্পরসিক ও চিত্ররসবেত্তা রূপে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আশা করলে অন্যায় হবে না।

আর্চর দম্পতি কালিঘাটের পট, পাটনার চিত্রশৈলী, শিখশৈলী, য়ুরোপীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জীবনের দেশীয় শিল্পীদের চিত্রাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে একাধিক পুস্তকের রচয়িতা। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে' রক্ষিত চিত্রাবলী সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকটির বিষয়

কোম্পানীর আমলের চিত্রকলা। সহজ কথায় অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকের এই চিত্রসম্ভার আমাদের কাছে মূল্যবান একাধিক কারণে। এই দুই শতকের পূর্বতন ভারতীয় চিত্রধারা ও চিত্ররচনা পদ্ধতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে মুঘল, রাজপুত, দখনী, ওড়িশী, চোলমণ্ডলীয় ও গুজরাট সমেত পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল অথবা হিমালয়াশ্রিত শৈলভূমিতে ও তৎসন্নিহিত সানুদেশের প্রাণস্পন্দনে বিকশিত হয়েছিল সেই চিত্র ও চিত্রী স্বদেশীয় ও বৈদেশিক অনুপ্রেরণা, উপকরণ ও প্রকাশরীতিকে আত্মস্থ করে একান্ত ভারতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্চর দম্পতির আলোচিত সময় পর্যায় দেশজ রীতি ও য়ুরোপীয় ভাবনা ও প্রয়োজনের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণের কাল। কাজেই সঙ্গত কারণেই এই সময়ের চিত্রধারায় আছে সেই বিষয়রীতির ছাপ যেটি পরবর্তীকালে আধুনিক বা সাম্প্রতিক ভারতীয় রূপকল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের দেশের চিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক। কারণ আমাদের সমস্ত চিত্র অলঙ্করণের নক্সা, মুদ্রিত ছবি ও মুদ্রিত পুস্তকের চিত্রসম্ভার একাধিকভাবে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের অবহেলিত ঐতিহ্যধারাবাহী ভারতীয় চিত্রকরদের অন্তিম প্রচেষ্টার ফল।

আলোচ্য পুস্তকটি একটি বিবরণমূলক বর্গীকৃত তালিকার আকারে গ্রথিত। এতে কোম্পানী আমলের চিত্রকলাকে দক্ষিণভারত, অযোধ্যা সমেত পূর্বভারত, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও দেহলী আগ্রা সমেত উত্তরভারত, পশ্চিমভারত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ক্যান্টন এই সাতটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কোম্পানী আমলের ছবিতে উৎকীর্ণ শব্দাবলীর অর্থ নির্দেশক তালিকা এবং আগ্রা দেহলী এলাকার ঐতিহাসিক সৌধ সম্পর্কিত চিত্রাদির জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। প্রধান পর্যায়সমূহের মধ্যে সাধারণতঃ একাধিক শহরকেন্দ্রিক চিত্র প্রয়াসকে একত্রিত করা হয়েছে।

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মাদ্রাজ সমেত দক্ষিণ ভারতের কোম্পানী চিত্র। এই শ্রেণীর চিত্রকলা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় থাকলেও এর সম্পর্কে নির্দেশযুক্ত আলোচনা আমাদের নিকট আসেনি। দক্ষিণী চিত্রাবলীর মধ্যে 'তাঞ্জোরের' কাঠের রথের ছবি (চিত্র সংখ্যা ৬), তাঞ্জোরের রাজ শোভাযাত্রা (৫) নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ (১৬) যথাক্রমে বর্তমান ভারতের কাষ্ঠরথ সংরক্ষক প্রদর্শক, ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদকে উৎসাহিত করার মত তথ্য প্রদানে সক্ষম। পাটনা শৈলীর এ প্রকারের চিত্রের কথা অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত। সেটি আর্চর যুগলের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, ভেলোর, কুর্গের পর আছে মুর্শিদাবাদ, কটক, পাটনা, কলিকাতার ছবি। এর মধ্যে পাটনা, কলিকাতার ছবি বহুদর্শিত ও আলোচিত। কিন্তু ছাপ্‌রা, আরা, বেনারসের চিত্র, যেমন রাম ও গুহকের ছবি (চিত্র সংখ্যা ৪৩) প্রভৃতির মধ্যে একটি অনাস্বাদিত দেশজভাব ও য়ুরোপীয়রীতির স্তিমিত মিশ্রণ দেখা যায়। লক্ষ্ণৌ বা অযোধ্যার হাতীর দাঁতের ছবি, কাগজে আঁকা ছবি প্রভৃতি আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে একাধিকবার কিন্তু আগ্রা দেহলীর জাঁকজমক দেখানো শোভাযাত্রাদির ছবি কিংবা দেশী কায়দায় বিদেশীয় 'নাবোব'দের নাচ দেখার ছবি (চিত্র সংখ্যা ৫৮ ও ৫৯) পূর্বতন রীতিতে হঠাৎ কর্তা হয়ে ওঠার পর ভারতীয় রাজা রাজড়ার অনুকরণকারী কোম্পানীর কর্মচারীদের সামাজিক অবস্থানের ও জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য দলিল। অন্যদিকে কাশ্মীরের তেলের ঘানি (চিত্র সংখ্যা ১০) কচ্ছের ঘেসেড়া (চিত্র সংখ্যা ১৩) পাটনার দুই হাতে

'কাঠপুতলী'র খেলা দেখানোর কথক অভিনেতা, পথের শিল্পী (চিত্র সংখ্যা ৩৯), ত্রিচিনাপল্লীর পাখীধরা ব্যাধ দম্পতি (চিত্র সংখ্যা ১১) ভারতীয় জন জীবনের যে চিত্র আমাদের সামনে এনে দেয় সেটা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে ও নৃতাত্ত্বিক মহলে আলোচিত 'মেটিরিয়াল কালচার' বা তৈজস নির্ভর বাস্তবিক জীবনযাত্রার অমূল্য উপাদান। এটা আশ্চর্যজনক যে জনসংখ্যা ও কারুশিল্প বিন্যাস নির্দেশক আদমশুমারি, বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রজ বিবরণ সংগ্রহ পদ্ধতিতে পূর্ণ সমসাময়িক ভারতে এই অমূল্য উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহার আজও হয় নি।

শিল্প পদ্ধতিতে এই সময়ের অধিকাংশ ছবি প্রধানতঃ জলরঙে আঁকা। একশ্রেণীর ছবিতে য়ুরোপীয় নিসর্গচিত্রের ক্ষয়বৃদ্ধি উপস্থিত। আর এক বর্গের চিত্র মূলতঃ স্থাপত্যের কাঠামোতে ধরে রাখা দরবারী দৃশ্যের ছবি যাতে পার্শ্বগত ভঙ্গির পূর্বী রীতি আলোছায়ার পশ্চিমী রীতির সঙ্গে মিশ্রিত। ভারতের বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমজীবিদের ছবি—সাদামাটা পশ্চাদপটের উপরে রক্ষিত তাদের বিশেষ হাতিয়ার বা উপকরণসহ একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে বিভিন্ন নির্ঘণ্টের সাহায্যে কোম্পানী আমলের শিল্পী-চিত্রকর, প্রত্নসৌধ ও প্রাসাদসমূহ এবং বিভিন্ন বৃত্তির কর্মীদের চিত্র কোথায় পাওয়া যাবে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিবরণমূলক তালিকায় চিত্র কোন চিত্ররক্ষণী বা 'অ্যালবামে' আছে, চিত্রের শিল্পী, আনুমানিক বা উৎকীর্ণ সময় অঙ্কন পদ্ধতি, কোন সংগ্রহের নিদর্শন ও মূল সংগ্রহকারীর বিবরণ প্রভৃতি তথ্য প্রদর্শিত। গ্রন্থে ৭৪টি সাদা কাল ছবি ও চারটি বহুবর্ণ ছবি আছে।

কলকাতার কড়েয়া (?) অঞ্চলের শেখ মুহম্মদ আমির, বেনারসের গোপালচাঁদও দক্ষিণের কয়েকজন শিল্পীদের চিত্র এই পুস্তকের চিত্র সম্ভারের মধ্যে কৌতূহলজনক। এসব ছবি অনেকাংশে য়ুরোপীয় কর্মচারী, সৈনিক, ভ্রমণকারী ও ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা বা তাদের ব্যক্তির পরিপার্শ্বের আদেশে প্রভাবে অঙ্কিত। কিন্তু কালের ও ইতিহাসের নিয়মে এতে ধরা আছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের বিবরণ। আলোচ্য গ্রন্থের সমশ্রেণীর চিত্র প্রধানতঃ কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে' ও অন্যান্য কয়েকটি সুপরিচিত সংগ্রহশালায় আছে। 'ইণ্ডিয়া অফিস' গ্রন্থাগারের অমূল্য সংগ্রহের এই তালিকা ও চয়নিকা যদি আমাদের কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানসমূহে একাধিকবার পরিভ্রমণের উৎসাহকে জাগরিত করে তাহলে এই গ্রন্থ রচয়িত্রীর যথার্থ উদ্যম কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে সার্থক হয়ে উঠবে। দেশীয় শিল্পীর পরিশ্রমে সৃষ্ট দেশজ জনজীবনের এই রূপ নিবিড়ভাবে দেখার প্রয়োজন আছে ও থাকবে।

আর্চর দম্পতি য়ুরোপীয় পেশাদার ও অপেশাদার চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলী নিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের সংগ্রহ থেকে আরও কাজ করেছেন।

পট ও পটুয়ার কথা আজ একটি সাধারণভাবে আলোচিত বিষয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মত কয়েকটি বিবরণে একপ্রকার ভাববাদী আধিক্য ও চিরাচরিত শিল্পরসচর্চা করা হয়ে থাকে। ফলে শিল্পপদ্ধতি, শিল্পায়নের ঐতিহ্য আগত উপাদান এবং শিল্পীসমাজের সংবাদ অন্তরালে চলে যায়। শ্রীমান দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যমপট ও পটুয়াদের অবলম্বন করে রচিত পুস্তিকাটি এই ঐতিহ্যবাহী

লোকশিল্পের প্রথাগত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। পটের বিষয়ানুগ শ্রেণীবিন্যাসে, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর শিল্পীদের উল্লেখে ও শিল্পনৈতিক রূপায়নের প্রাথমিক বর্ণনার সহায়তায় বীরভূমের পটভূমিকে উপযুক্তভাবে উদ্ভাসিত করে তোলার প্রয়াসটি সুন্দর। এটা আনন্দের কথা যে লেখক চমকপ্রদ কথা বা ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পটের অঙ্কনমাধ্যম, পটের কাগজ ও কাপড়, রঙ-তুলি, পটের গান, পটুয়ার জীবিকা প্রভৃতি বিষয়কে ছেঁদো ভদ্রতার ঠেলায় পড়ে কোন রকমেই উপেক্ষা করেন নি। পটুয়ারা আদতে আর্য কিনা একথা আমাদের দৃষ্টিতে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে যমের দেহ রূপায়নের রীতি মধ্যযুগের অন্তর্গত ও মধ্যযুগ পরবর্তী রাজ রাজড়ার আদর্শে রচিত কিনা সেটি ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। যমের ছবিতে দৃষ্ট শিরস্ত্রাণ, বেশভূষা, জুতা, জামা, কাপড় খুঁটিয়ে দেখলে বঙ্গীয় পটরীতির অধুনামন্থর স্রোতধারায় বা প্রবাহে সমসাময়িক কালের ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার কাজটি সরল হয়ে উঠবে। অবশ্য বহুদিনব্যাপী প্রচলিত লৌকিক আচরণে প্রাচীন রীতিও নবীন ভঙ্গিমার সহাবস্থান হওয়াতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। পুস্তিকার মধ্য অংশে আলোচিত বৌদ্ধ, পৌরাণিক এ লৌকিক কামনা মণ্ডিত পরলোক-স্বর্গ-নরক জন্মান্তরের কাহিনীটি সুন্দরভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু জীবনকেন্দ্রিক কোন সামাজিক পরিবেশে স্বর্গ-নরক ও যমপুরীর রূপকল্পনা পটুয়াসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল শিল্পী কথক-গায়ক-দর্শক শ্রোতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেই বিবরণটি আরও বিস্তারিত হলে কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ হত। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবি, চাষী শিল্পীকে লোকজীবনের প্রসারতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করার কাজটি সময় সাপেক্ষ। এই কারণে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তিকাটিতে সিউড়ির নিকটস্থ ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন পটুয়া ও সরধার বাঁকু চিত্রকর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দুটি একটি প্রয়োজনীয় অভাব মিটিয়েছে। এই দুই শিল্পীর বৃত্তান্তে পট পটুয়া সমাজের এমন অনেক সাদামাটা তথ্য আছে যেটা উদ্ভাসিক ও পেশাদার লোকশিল্প-চর্চাকারীরা অগ্রাহ্য করেন। বিশেষ করে লেখক পটুয়া চিত্রকরদের কাঠের রথের ছবি, মাটির পুতুল, প্রতিমা নির্মাণ করার কথাটি তুলে ধরে শিল্প ক্ষেত্রে এক ধরণের সমাজবদ্ধ প্রথা ও শিল্প মাধ্যম অতিক্রান্ত সঙ্করণের সংবাদ দিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই তথ্যের ভিত্তিতে দেশজ কলা সম্পর্কে একটি সর্বব্যাপী ও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রচেষ্টা করবেন বলে আশা রাখা অন্যায় নয়।

যমপটে দৃষ্ট রাজসভা বিষয়ক চিত্রের মধ্যে এক প্রকারের দেহ সংস্থাপন সংক্রান্ত ধারা আছে যেটি রাজকীয় চিত্রাবলীর স্বদেশীয় রূপকল্পনার দ্বারা কতটা প্রভাবিত অথবা কতটা অনুপ্রাণিত সমসাময়িক নবাব জমিদার অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলের চিত্রভাবনা ও চিত্রকল্পের দ্বারা সেই তথ্য দর্শক পাঠকের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস থাকলে বইটি অধিকতর কার্যকরী হত। যমপুরীতে দৈহিক নির্যাতনের চিত্র কাহিনীর অবশ্যই একটা সমাজভিত্তিক কার্যকারণ এবং পটভূমিকা আছে। এই পশ্চাতপটের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সামাজিক মূল্য অপরিসীম। 'দণ্ডনীতির প্রকৃতি-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য স্বভাবজ রূপে এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। এর সঙ্গে আছে ঐতিহ্যবাহী প্রবাহে ভাসমান ভারতীয় শিল্পীকুলের অদ্ভুত রস ও ভয়ানক রসের আলেখ্য রচনার কুশলতার কালক্রমিক, অঞ্চল নির্দিষ্ট ও তুলনা নির্ভর বিচার। এই সামাজিক ও শিল্পকৌশলগত বক্তব্য বর্তমানে সুপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত পট পটুয়া সম্পর্কিত পুস্তকাদিতে অনুপস্থিত।

শ্রীমান্ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রয়াসে গ্রথিত এই পুস্তকে লোকাশ্রিত পটুয়াদের নাম ও কর্মস্থানের তালিকা বর্তমানে বীরভূমের পটুয়া অধ্যুষিত গ্রামের নাম, রঙ ও মিশ্রণ মাধ্যমের সংবাদাদি চিত্রাবলী প্রভৃতি মূল লেখার বিষয়কে উপযুক্তভাবে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করবে।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা ও তাঁদের সহযোগীগণ বাংলার লোক শিল্প আলোচনায় পর্যালোচনায় যে সবল ও সুস্থ বক্তব্য, সাদামাটা প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের রীতি আনয়নের প্রয়াস করেছেন সেই ধারায় শ্রীমান্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বিবরণাদি যুক্ত হলে আমরা আনন্দিত হব।

চিত্র রয়েছে ঘটে, পটে, প্যাটায়, পাতায়, বস্ত্রাঞ্চলে, কাগজ কাপড়ের টানা পাড়ে। কখনও সে চিত্র প্রতীকী, কখনও আলঙ্কারিক কখনও বিষয় বা ভাব বর্ণনে নিয়োজিত। একরঙা রৈখিক ভঙ্গে সম্পূর্ণ অথবা রঙীন আরোপন, অনুলেপনে ভাব ও বিষয়ব্যঞ্জক। সূক্ষ্মতায় মনোমুগ্ধকর ও বেথারঙের কারিগরীতে রসোত্তীর্ণ অথবা সহজ লোকলীলার ছন্দে স্পন্দিত। চিত্র ও চিত্রায়ন ইতিহাসের— সমাজের ও সমাজমানসের দর্শনযোগ্য তথ্যভাণ্ডার। ভারতীয় চিত্রকলার এই সম্পদ সাধারণের আয়ত্তাধীন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আছে। উপরে বর্ণিত চিত্র সম্ভার ও তার সমশ্রেণীর সংগ্রহ গুরুসদয় সংগ্রহালয়, আশুতোষ মিউজিয়ম, বারাণসীর ভারতকলা ভবন, গৌহাটির আসাম রাজ্য সংগ্রহশালা, পাটনা মিউজিয়ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হয়ে আছে সুরসিক পাঠক দর্শকের অপেক্ষায়।

সন্তোষকুমার বসু